সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

অক্টোবর ২০১৬

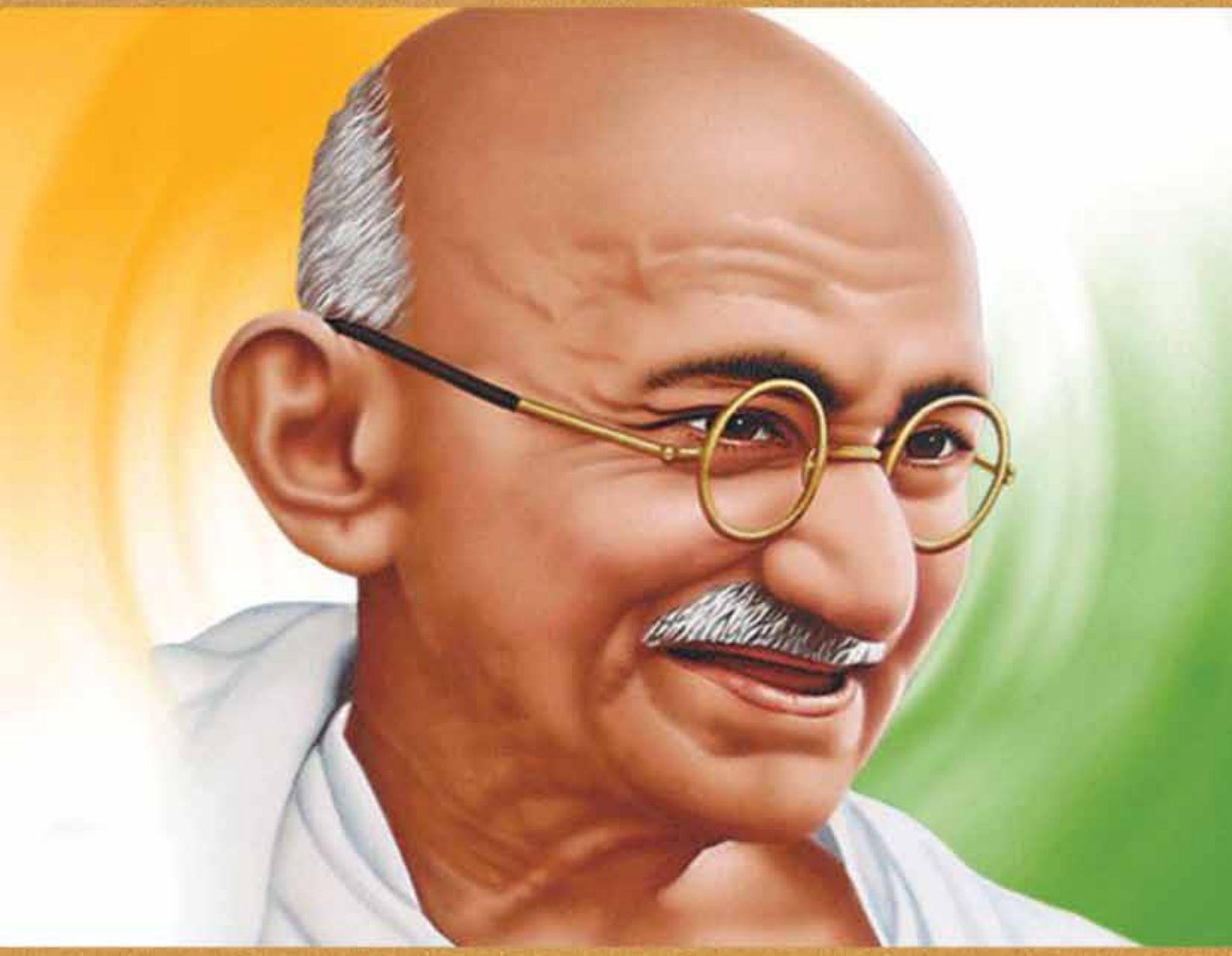

গান্ধীবাদ এবং...

১১ সেপ্টেম্বর ২০১৬
পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে
বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনার সঙ্গে হাই কমিশনার
শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার শুভেচ্ছা বিনিময়

০৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬
বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী
মো. শাহরিয়ার আলমের সঙ্গে
হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার
সৌজন্য সাক্ষাৎ

৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ ঢাকায়
অনুর্ধ্ব ১৮ এশিয়া কাপ হকি টুর্নামেন্টে
বিজয়ী ভারতীয় হকি দলের খেলোয়াড়দের
মাঝে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা।
টুর্নামেন্টে ভারত ৫-৪ গোলে
বাংলাদেশের বিপক্ষে জয়লাভ করে

প্রবীণ নাগরিকদের ভিসা সার্ভিসের জন্য প্রশংসাকারী এক বাংলাদেশী নাগরিকের মন্তব্য শেয়ার করতে পেরে আমরা খুশি। এ কে মাসুদ আহমেদ নামে ঐ প্রবীণ লেখেন, 'প্রবীণ নাগরিকদের ভিসা সার্ভিসের জন্য ভারতীয় হাই কমিশন ও স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার সার্ভিস সর্বোৎকৃষ্ট। আমাদের প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা।' হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা তাঁর এ সদয় মন্তব্যের জন্য জনাব মাসুদকে ধন্যবাদ জানান

Excellent services by India High Commission & State Bank of India for for Senior Citizen's Visa Services. Our Compliments.

dated 19/09/2016
A.K. MASOOD AHMED

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ চুয়াল্লিশ | সংখ্যা ০৯ | আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৩ | অক্টোবর ২০১৬

www.hcidhaka.gov.in
Facebook page: /IndiaInBangladesh; @ihcdhaka
IGCC Facebook page: /IndiraGandhiCulturalCentre

Bharat Bichitra
Facebook page: /BharatBichitra

চিলিকা হ্রদের দেশে // পৃষ্ঠা: ৪৪

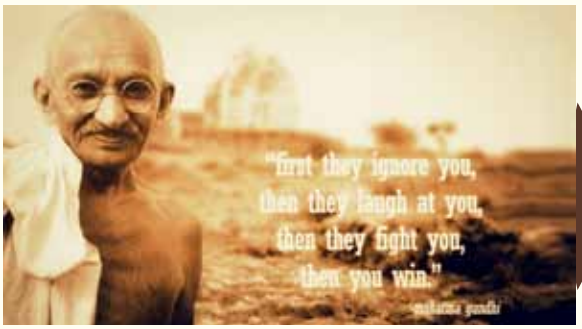

০৬ থেকে ১০

গান্ধীবাদ এবং...

বিশ্বের যে-কোন প্রান্তের অন্যায়-অবিচার, গণতন্ত্রের লড়াই, স্বৈরাচার-বর্ণবাদের বিরুদ্ধে বিরামহীন লড়াইয়ে এখনও গান্ধীজী আমাদের পথ-প্রদর্শক। এই মানুষটিকে নানাভাবে চিহ্নিত করার সুযোগ আছে– বহু মানুষ তাঁর ধর্মকে রাজনীতিতে টেনে আনার ঘোর বিরোধী। তারা বলছেন, গোলমাল নাকি সেখান থেকেই শুরু। কিন্তু এ-কথা ভুললে চলবে না যে, ধর্মকে রাজনীতির পাশাখেলায় তিনি পরিণত করেননি, তার বহু আগে থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এর চর্চা হয়ে আসছিল। গান্ধীজী শুধু এ উপমহাদেশে তাঁর মত করে শান্তির অমৃতবাণী ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন ধর্মের আবরণে। আর কে না জানে, ধর্মই আজও পর্যন্ত আমজনতার নাভিকেন্দ্র! ভারতপথিক গান্ধীজী তাই ধর্মকে জাতীয়তাবাদের পরিপূরক করে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, ধর্মই মানুষকে ধারণ করে। গান্ধীজী তাঁর জীবনাচরণেই তাঁর মতবাদের পথরেখা দিয়ে গিয়েছিলেন। সে-কারণে গভীর প্রত্যয় নিয়ে তিনি বলতে পেরেছিলেন, 'আমার জীবনই আমার বাণী'।

সূ চি প ত্র

কর্মযোগ	ইন্দ্রা ২০১৬ ॥ ভারত-রুশ যৌথ সামরিক মহড়া	০৪
	উরি হামলায় বাংলাদেশসহ বিশ্বনেতৃবৃন্দের ক্ষোভ	০৪
	শেখ হাসিনার জন্মদিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শুভেচ্ছা	০৫
শ্রদ্ধাঞ্জলি	গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে আলোকচিত্র প্রদর্শনী	০৬
	গান্ধীবাদের মূলনীতি	০৭
	গান্ধীনীতি পূর্ব থেকে পশ্চিম ॥ আনারুল হক আনা	০৯
বিজ্ঞান	১০৩তম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস ॥ তপন চক্রবর্তী	১১
	আটটি উপগ্রহ নিয়ে মহাকাশে নয়া উচ্চতায় ভারত	১৪
উচ্চশিক্ষা	বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য স্কলারশিপসমূহ	১৬
উৎসব	বাঙালির সার্বজনীন উৎসব ॥ সংঘমিত্রা সাহা	১৭
	দুর্গাপূজার ইতিহাস ও সামাজিক দিক ড. কানাইলাল রায়	১৮
ছোটগল্প	নীলপিঁপড়ে ॥ শমীক ঘোষ	২০
	কুয়াকাটায় দুই নারী ॥ সালেহা চৌধুরী	২৬
কবিতা	অমানিতা সেন ॥ অনীক মাহমুদ	২৪
	সাবিনা ইয়াসমিন ॥ অমিতাভ চক্রবর্তী	
	দীপক লাহিড়ী ॥ পৃথ্বীশ চক্রবর্তী	২৫
রাজ্য পরিচিতি	আসাম	৩১
রান্নাঘর	আসামের রান্না	৩৭
ধারাবাহিক	পাসিং শো ॥ অমর মিত্র	৩৮
	চিলিকা হ্রদের দেশে ॥ দীপিকা ঘোষ	৪৪
শেষ পাতা	এ পি জে আবদুল কালাম	৪৮

সম্পাদক নান্টু রায়
ফোন ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯ এক্স: ১২২৪
e-mail: editor.bb@hcidhaka.gov.in

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ভারতীয় হাই কমিশন
বাড়ি ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
গ্রাফিক্স মো. রেদওয়ানুর রহমান

মুদ্রণ ডটনেট লিমিটেড
৫১/৫১এ পুরানা পল্টন ঢাকা-১০০০ ফোন ৯৫৬২১৯৮

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই।
এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

পাঠকের পাতা

পাঠকদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন

বাংলাদেশের এক অবহেলিত জনপদের নাম দক্ষিণাঞ্চল। আমরা সেই জনপদের অধিবাসী। এখানে সূর্য ওঠে ২৪ ঘণ্টা পর। বলছি এ কারণে যে, এখানে একটি জাতীয় দৈনিক পৌঁছয় প্রায় ১ দিন পরে। ইদানিং বিকালে পড়ার সুযোগ পাই। *ভারত বিচিত্রা* পড়ার মাধ্যমে ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সম্পর্কে অনেক কিছু জানার সুযোগ পায় দক্ষিণাঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত মানুষগুলো। সেজন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে। আমাদের গ্রামভিত্তিক এই ক্ষুদ্র পাঠাগারের অগণিত পাঠক-পাঠিকা। সম্প্রতি শিক্ষিত সমাজে অনেকে অন-লাইনে পত্রিকাটি পড়ে থাকেন, কিন্তু বিদ্যুৎবিহীন গ্রামের ছাত্র/ছাত্রী ও জ্ঞানপিপাসু অভিভাবকদের মধ্যে *ভারত বিচিত্রা*র সচিত্র সংখ্যার চাহিদা এখনো সর্বাধিক। সম্প্রতি ভারতের সহায়তার দক্ষিণাঞ্চলের বাগেরহাট জেলার রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, রেল যোগাযোগ, বাস চলাচলের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়নে ভারত সরকার যে সহায়তার হাত বাড়িয়েছে এজন্য *ভারত বিচিত্রা*র পাঠকদের পক্ষ থেকে উভয় দেশের সরকারকে অভিনন্দন।

গৌতমকুমার মণ্ডল প্রভাষক
শহীদ শেখ আবু নাসের মহিলা ডিগ্রি কলেজ
কচুয়া, বাগেরহাট

নিজেকে সমৃদ্ধ করতে চাই

আমি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক এবং *ভারত বিচিত্রা*র পাঠক। ভারতবর্ষকে জানতে এবং দেশের সনাতন ধর্ম শিক্ষা সংস্কৃতি শিল্প সাহিত্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে পত্রিকাটির কোন তুলনা নেই। আমি ইতোমধ্যে পত্রিকাটি সংগ্রহ করে পাঠ করেছি। কিন্তু গ্রাহক না হওয়ার কারণে সকল প্রকাশনা নিয়মিত পড়তে পারি না। তাই নিয়মিত গ্রাহক হয়ে *ভারত বিচিত্রা* পাঠ করে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে চাই এবং আমার ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে অবগত করতে চাই।

পপি বৈরাগী শিক্ষক
কিসমত ফুলতলা, বটিয়াঘাটা, খুলনা

উন্নত ও রুচিঋদ্ধ

জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রফিকুল ইসলাম মহিলা কলেজ এতদঞ্চলের একটি শীর্ষস্থানীয় নারী শিক্ষা বিদ্যাপীঠ। এ প্রতিষ্ঠানে দুই হাজার পাঁচশো তেইশজন শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক, ডিগ্রি (পাশ) ও অনার্স পর্যায়ে পড়াশুনা করে। কলেজের একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার রয়েছে এবং শিক্ষক/শিক্ষার্থীবৃন্দ এখানে নিয়মিত পড়াশুনা করেন। *ভারত বিচিত্রা*র মত একটি উন্নত ও রুচিঋদ্ধ পত্রিকা কলেজ লাইব্রেরিতে থাকলে পাঠকেরা প্রভূত উপকৃত হবেন বলে আমরা মনে করি।

অনুগ্রহ করে আমাদের কলেজের জন্য দুই কপি *ভারত বিচিত্রা* সৌজন্য কপি হিসেবে প্রেরণ করে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানতৃষ্ণা মেটাতে মূল্যবান সহযোগিতা করবেন।

মো. শরীফ উদ্দিন আহমেদ অধ্যক্ষ
রফিকুল ইসলাম মহিলা কলেজ
ভৈরব, কিশোরগঞ্জ

অত্যাবশ্যকীয়

গ্রাহক তালিকা পর্যালোচনা ও হালনাগাদ ফর্মটি পূরণ করে পাঠাতে দেরি হল বলে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লেখায় মনে কিছু করবেন না। আমি এবং আমাদের শিল্পী সংসদের সদস্য/সদস্যাবৃন্দ *ভারত বিচিত্রা*র নিয়মিত পাঠক। শিল্পী সংসদের নামে বহুকাল আগে থেকেই আপনাদের পাঠানো *ভারত বিচিত্রা* নিয়মিত পেয়ে থাকি। ডাকযোগে সংসদের সম্পাদক বরাবর পত্রিকাটি পাঠানো হয়ে থাকে। বর্তমানেও আমি শিল্পী সংসদের সম্পাদক পদেই বহাল আছি।

ভারত বিচিত্রা পাঠ করে আমরা আমাদের প্রতিবেশী দেশ বিশাল ভারত সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারছি। *ভারত বিচিত্রা* পাঠ বর্তমানে আমাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক সংখ্যা না পেলে অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেছি বলে মনে হয়। তাই বর্তমানেও যাতে নিয়মিত *ভারত বিচিত্রা* পাই সে ব্যাপারে আপনাদের পর্যালোচনায় আমাদের সংসদের নাম হালনাগাদ গ্রাহক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি।

জীবনকৃষ্ণ মন্ডল সাধারণ সম্পাদক
শিল্পী সংসদ, খেপুপাড়া
কলাপাড়া, পটুয়াখালী

কষ্ট অনুভব করি

ভারত বিচিত্রা পত্রিকাটির প্রয়োজনীয়তা বলে শেষ করা যাবে না। তবু এটুকু বলি যে, আমার শিক্ষক জীবনের অনেক অপূর্ণতা বহুলাংশে পত্রিকাটি পূর্ণ করেছে। তাই নিয়মিত পেতে চাই পত্রিকাটির মুদ্রিত সংস্করণ। যদিও অনেকে আজকাল ইন্টারনেটেও পত্রিকাটি পড়তে পারছেন।

পাশাপাশি সমৃদ্ধ হচ্ছে আমার প্রতিষ্ঠিত স্বদীপ পাঠাগারটি। এক সময়ে নিয়মিত পেতাম। গ্রাহক সংখ্যা ছিল ৬৩৯২। বন্ধ হয়ে যাওয়াতে ভীষণ কষ্ট অনুভব করি।

আশা করি, ভারতীয় হাই কমিশন কর্তৃপক্ষ *ভারত বিচিত্রা* পত্রিকাটি নিয়মিত পাওয়ার ব্যবস্থা করে আমাকে কৃতজ্ঞ করবেন।

গৌরহরি বৈরাগী শিক্ষক
কিসমত ফুলতলা, বাটিয়াঘাটা, খুলনা

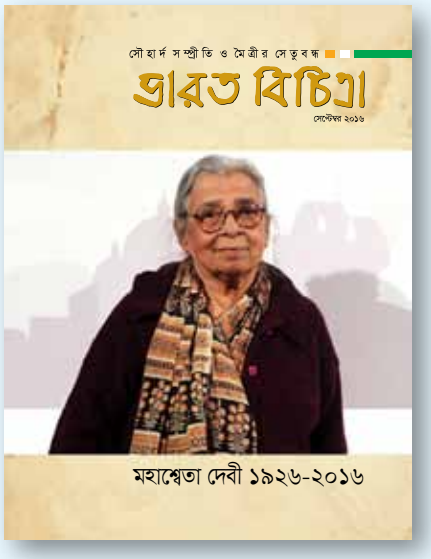

সংখ্যাগুলো অসাধারণ

*ভারত বিচিত্রা*র আমি একজন নিয়মিত পাঠক, আমি বিগত কয়েক মাস সহকারী ভারতীয় হাই কমিশন, চট্টগ্রাম অফিস থেকে *ভারত বিচিত্রা*র সংখ্যা সংগ্রহ করতাম। সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আপনাদের সংখ্যাগুলো অসাধারণ, পড়ে খুব ভাল লাগে।

কথা হচ্ছে, আমি এখন যে স্থানে বাস করছি সেখান থেকে *ভারত বিচিত্রা*র সংখ্যা সংগ্রহ করা আমার জন্য কষ্টের ব্যাপার। আমার ঠিকানায় *ভারত বিচিত্রা*র একটি সংখ্যা নিয়মিতভাবে পাঠানোর ব্যবস্থা করলে কৃতজ্ঞ থাকব।

মোহাম্মদ সেলিম
প্রযত্নে মৃত জানে আলম
মরিয়ম নগর (সওদাগর পাড়া)
রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম

বহুল প্রচারিত

খানজাহান আলীর স্মৃতিবিজড়িত বাগেরহাটের কচুয়া উপজেলা সদরের সন্নিকটে অবস্থিত *নবারুণ সংঘ* একটি ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানসম্মিলনী। সামাজিক সাংস্কৃতিক ও মানব উন্নয়নমূলক কাজে সংঘটি জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এলাকার সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। সংগঠনের সদস্যরা প্রতিদিন সংঘে সমবেত হয়ে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা ও ম্যাগাজিন পড়ে থাকেন এবং আড্ডায় মেতে ওঠেন। অভিন্ন সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হওয়ায় আমাদের দুই দেশের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনে *ভারত বিচিত্রা*র জুড়ি নেই। আমাদের সংঘে বহুল প্রচারিত সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ *ভারত বিচিত্রা*র একটি কপি নিয়মিত পাঠানোর ব্যবস্থা করে বাধিত করবেন।

সজলবরণ সভাপতি
নবারুণ সংঘ, উত্তর গোপালপুর, বাগেরহাট

সম্পাদকীয়

গান্ধীজী আজ আর আমাদের মাঝে নেই কিন্তু তাঁর আদর্শ, তাঁর অপরিমেয় কর্মযজ্ঞ, তাঁর অবিনশ্বর মতবাদ, তাঁর অনুসরণীয় জীবনাচরণ– সবই রয়ে গেছে, পাথেয় হয়ে আছে। ভারত ও বাংলাদেশের অনেক প্রতিষ্ঠান গান্ধীজীর জীবনাদর্শ প্রচার করে চলেছে, তাঁর কর্মযজ্ঞের অনুসরণ করে চলেছে। বিশ্বের যে-কোন প্রান্তের অন্যায়-অবিচার, গণতন্ত্রের লড়াই, স্বৈরাচার-বর্ণবাদের বিরুদ্ধে বিরামহীন লড়াইয়ে এখনও গান্ধীজী আমাদের পথ-প্রদর্শক। এই মানুষটিকে নানাভাবে চিহ্নিত করার সুযোগ আছে– বহু মানুষ তাঁর ধর্মকে রাজনীতিতে টেনে আনার ঘোর বিরোধী। তারা বলছেন, গোলমাল নাকি সেখান থেকেই শুরু। কিন্তু এ-কথা ভুললে চলবে না যে, ধর্মকে রাজনীতির পাশাখেলায় তিনি পরিণত করেননি, তার বহু আগে থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এর চর্চা হয়ে আসছিল। গান্ধীজী শুধু এ উপমহাদেশে তাঁর মত করে শান্তির অমৃতবাণী ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন ধর্মের আবরণে। আর কে না জানে, ধর্মই আজও পর্যন্ত আমজনতার নাভিকেন্দ্র! ভারতপথিক গান্ধীজী তাই ধর্মকে জাতীয়তাবাদের পরিপূরক করে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, ধর্মই মানুষকে ধারণ করে। গান্ধীজী তাঁর জীবনাচরণেই তাঁর মতবাদের পথরেখা দিয়ে গিয়েছিলেন। সে-কারণে গভীর প্রত্যয় নিয়ে তিনি বলতে পেরেছিলেন, 'আমার জীবনই আমার বাণী'। চলতি সংখ্যায় গান্ধীবাদের ওপর আলোকপাতের চেষ্টা করা হল, গান্ধীজয়ন্তীতে এই আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি– আশা করি পাঠকদের ভাল লাগবে।

আমাদের কালের অন্যতম কথাশিল্পী কবি নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পরলোকগমন করেছেন। পরিণত বয়সেই তাঁর প্রস্থান, তবু সৃজনশীলতার জগতে এ এক অপূরণীয় ক্ষতি নিঃসন্দেহে। দীর্ঘ দিনের চর্চা ও অধ্যবসায়ে যে ভুবন তিনি নির্মাণ করেছিলেন, তাকে সমীহ না করে উপায় নেই। তবু তাঁর গুণমুগ্ধদের মনে আক্ষেপ রয়ে যাবে এই ভেবে যে, তিনি হয়তো তাঁর সৃজনশীলতার প্রতি যথেষ্ট সুবিচার করেননি! তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী কিন্তু প্রতিনিয়ত দিগ্‌বলয় পরিবর্তনের ফলে তাঁর যে স্বচ্ছন্দ বিচরণক্ষেত্রে কথাশিল্প, সেখানে সময় কম দিয়েছেন বলে মনে হয়। আরেকটু বেশি সময় দিলে বাংলাসাহিত্য তাঁর অনুপম গদ্যশৈলীতে আরও বাঙ্ময় হয়ে উঠত। কীসের তৃষ্ণায় যে হকভাই সারাজীবন ছুটে বেড়ালেন, তা হয়তো উত্তরকালে তাঁর পাঠক ও গবেষকেরা খুঁজে বের করবেন। তিনি ছিলেন আমাদের অভিভাবক। যাঁরা লেখালেখি করেন, কী সম্পাদনা করেন, তাদের জন্য তাঁর *মার্জিনে মন্তব্য* অবশ্যপাঠ্য বই। আর *খেলারাম খেলে যা*-র পারভারশান যে কীভাবে লেখা যায় তা হকভাই ছাড়া কেউই বোধহয় বলতে পারবেন না। তিনি আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন, আমাদের মননকে আধুনিক করে তুলেছেন। সচেতনভাবে হকভাই অবৈজ্ঞানিক কিছু তাঁর পাঠকের ঘাড়ে চাপিয়ে দেননি, তাঁর কৃতিত্ব এখানেই।

ইন্দ্রা ২০১৬

ভ্লাদিভোস্তকে ভারত-রুশ যৌথ সামরিক মহড়া

২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬ রাশিয়ার ভ্লাদিভোস্তকের উসিরিস্ক জেলায় ভারত-রাশিয়া যৌথ সামরিক মহড়া 'ইন্দ্রা ২০১৬'-র ৮ম সংস্করণ শুরু হয়। এ যৌথ সামরিক মহড়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, জাতিসংঘ ম্যান্ডেটের আওতাভুক্ত আধা-পাহাড়ি ও জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ। যৌথ মহড়ার তথ্য-উপাত্ত বিনিময়ে উভয় দেশের সৈন্যরা এ ধরনের অভিযানের জন্য স্ব স্ব দেশের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। এ লক্ষ্যে ১১ দিনের ব্যাপক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

ইন্দ্রা ২০১৬ মহড়ার উদ্দীপনাময় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনির সদস্যরা রুশ সেনাবাহিনির পাশে সমবেত হয়। উভয় বাহিনিই ঐক্যবদ্ধভাবে অধিকতর ভারত-রাশিয়া বন্ধুত্ব প্রদর্শনপূর্বক অভিবাদনমঞ্চ অতিক্রম করে। ভারতীয় বাহিনির কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার সুকৃত চাঁধা দুই বাহিনির উদ্দেশ্যে বক্তৃতায় সন্ত্রাস মোকাবেলায় দুই দেশের মধ্যে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। ক্রাই প্রদেশের ভাইস গভর্নর মি. লোজ এবং রুশ সেনাবাহিনির পঞ্চম বাহিনির সিওএস মেজর জেনারেল আদ্রেঁ ইভানোভিচ সিচেভোও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

কুমায়ুন রেজিমেন্টের ২৫০জন সৈন্য ভারতীয় বাহিনির প্রতিনিধিত্ব করেন এবং রুশ বাহিনির প্রতিনিধিত্ব করেন সে-দেশের ৫৯তম মোটোরাইজড পদাতিক ব্রিগেড। ২০০৩ সাল থেকে ইন্দ্রা পর্বের দ্বিপক্ষীয় মহড়া হচ্ছে ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে অন্যতম প্রধান দ্বিপক্ষীয় প্রতিরক্ষা সহযোগিতা উদ্যোগ। ভারতীয় বাহিনি অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে মহড়া শেষে ভারতে ফিরে আসে। • বিজ্ঞপ্তি

উরি হামলায় বাংলাদেশসহ বিশ্বনেতৃবৃন্দের ক্ষোভ

১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ কাশ্মীরের উরিতে ভারতীয় সেনা ছাউনিতে এক বর্বরোচিত হামলায় ১৭জন সৈন্য প্রাণ হারায়, আহত হয় আরো অনেকে। এই কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ডে তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা জানিয়ে বিশ্বনেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদিকে বার্তা পাঠান।

হামলার পরদিন অর্থাৎ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদিকে এক চিঠিতে লেখেন, 'গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ কাশ্মীরের উরিতে অবস্থিত সেনাঘাঁটিতে বর্বরোচিত সন্ত্রাসী হামলায় ১৭জন সৈন্য নিহত ও আরো অনেকের আহত হওয়ার খবরে আমি গভীর দুঃখবোধ করছি। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে যে-সব সৈন্য তাদের মূল্যবান জীবন হারিয়েছেন, তাদের শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের অন্তরের গভীরতম শোক ও আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আমরা বীর ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনির আহত জওয়ানদের দ্রুত সুস্থতাও কামনা করছি।

'বাংলাদেশ যে-কোন ধরনের সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাসী চরমপন্থার তীব্র নিন্দা জানায়। সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাসী চরমপন্থার বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতিতে অটল থেকে বাংলাদেশ এই সংকটের মুহূর্তে দৃঢ় প্রত্যয়ে ভারতের পাশে দাঁড়াচ্ছে। ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও প্রতিবেশী হিসেবে আমরা এতদঞ্চল থেকে আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদের করাল থাবা মুছে ফেলার অভিন্ন প্রচেষ্টায় একযোগে কাজ করব।

'মহাত্মন, আপনি আমার সর্বোচ্চ বিবেচনার আশ্বাস গ্রহণ করুন।'

• বিজ্ঞপ্তি

জম্মু ও কাশ্মীরের উরিতে হামলার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃঢ় প্রতিক্রিয়া

শেখ হাসিনার জন্মদিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শুভেচ্ছা

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিনে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ এক শুভেচ্ছা বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আপনার জন্মদিনে আমার অন্তরতম অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা।

'দুঃসময়ে আপনার দৃঢ় নেতৃত্ব বাংলাদেশের জনগণকে আশার আলোক সংকেত দেখিয়েছে। উন্নয়ন থেকে নিরাপত্তায় বাংলাদেশ আপনার পারঙ্গম তত্ত্বাবধানে সকল নাগরিকের জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এর অগ্রগতির পথে জোর কদমে এগিয়ে চলেছে।

'আগামী মাসে গোয়াতে আপনাকে স্বাগত জানাতে এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে আমাদের অভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আমি উদ্গ্রীব হয়ে আছি।

'মাননীয়া, আপনি দয়া করে আমার সর্বোচ্চ বিবেচনার আশ্বাস গ্রহণ করুন।'

• বিজ্ঞপ্তি

২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ ঢাকায় দৈনিক *এশিয়ান এইজ* আয়োজিত 'টেকসই প্রবৃদ্ধি দ্রুতকরণে ভারত-বাংলাদেশ পারস্পরিক সহযোগিতা' শীর্ষক সেমিনারে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা এবং বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও ভারত সরকারের এনআইটিআই আয়োগ-এর সদস্য শ্রী বিবেক দেবরায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন

০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ ঢাকায় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা গোলাম সারোয়ারের নেতৃত্বে বাংলাদেশের অন্যতম নেতৃস্থানীয় সংবাদপত্র দৈনিক *সমকাল*-এর সহকারী সম্পাদক ও প্রতিবেদকদের সঙ্গে মত-বিনিময়ের জন্য *সমকাল* অফিসে যান। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ব্যাপকভিত্তিক দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক বিষয়ে প্রতিবেদকদের অবহিত করতে হাই কমিশনার তাঁদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন

১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ ঢাকায় ডেইলি স্টার সেন্টারে যৌথভাবে *দ্য ডেইলি স্টার* ও *আইপিএজি* আয়োজিত 'বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক: অগ্রগতি ও সামনের চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক সংলাপে ডেপুটি হাই কমিশনার ড. আদর্শ সোয়াইকা বক্তব্য রাখছেন

৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ ভারত সফরে আমন্ত্রিত বাংলাদেশের পনেরজন সাংবাদিক এবং সম্পাদকের সম্মানে দেওয়া বিদায় সংবর্ধনায় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা

গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে ভারতীয় হাই কমিশনে আলোকচিত্র প্রদর্শনী এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রবাসী ভারতীয় কেন্দ্র উদ্বোধন

গান্ধীজী ধর্মকে রাজনীতির পাশাখেলায় পরিণত করেননি, তার বহু আগে থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এর চর্চা হয়ে আসছিল। গান্ধীজী শুধু এ উপমহাদেশে তাঁর মত করে শান্তির অমৃতবাণী ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন ধর্মের আবরণে। আর কে না জানে, ধর্মই আজও পর্যন্ত আমজনতার নাভিকেন্দ্র! ভারতপথিক গান্ধীজী তাই ধর্মকে জাতীয়তাবাদের পরিপূরক করে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, ধর্মই মানুষকে ধারণ করে। গান্ধীজী তাঁর জীবনাচরণেই তাঁর মতবাদের পথরেখা দিয়ে গিয়েছিলেন। সে-কারণে গভীর প্রত্যয় নিয়ে তিনি বলতে পেরেছিলেন, 'আমার জীবনই আমার বাণী'।

গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে ঢাকার ভারতীয় হাই কমিশনের নতুন চ্যাঞ্চেরি কমপেক্সে এক সরাসরি ওয়েব সম্প্রচারে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির প্রবাসী ভারতীয় কেন্দ্র উদ্বোধন প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ভারতীয় নাগরিক, হাই কমিশনের কর্মকর্তা ও প্রচার মাধ্যমের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এ উপলক্ষে মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও সময়ের ওপর একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে গান্ধীজীর শৈশব, দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর অবস্থান ও সত্যাগ্রহ প্রবর্তন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অহিংস আন্দোলনসহ বিভিন্ন আন্দোলনে নেতৃত্বদান প্রতিফলিত হয়। ১৯৪৬ সালে গান্ধীজীর নোয়াখালী সফরের দুটি বিরল আলোকচিত্রও প্রদর্শিত হয়।

অনুষ্ঠানে সোয়াচ ভারত অভিযান এবং ইন্ডিয়া@৭০ নামে দুটি স্বল্পদৈর্ঘ্য ভিডিও প্রদর্শিত হয়।

• বিজ্ঞপ্তি

গান্ধীবাদের মূলনীতি

সত্য

গান্ধীজী তার জীবনকে সত্য অনুসন্ধানের মহৎ উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি নিজের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে এবং নিজের উপর নিরীক্ষা চালিয়ে তা অর্জন করেছিলেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীর নাম দিয়েছিলেন *দি স্টোরি অফ মাই এক্সপেরিমেন্টস উইথ ট্রুথ* যার অর্থ সত্যকে নিয়ে আমার নিরীক্ষার গল্প। গান্ধীজী বলেন, তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ ছিল নিজের অন্ধকার ভয় ও নিরাপত্তাহীনতাকে কাটিয়ে ওঠা। গান্ধীজী তাঁর বিশ্বাসকে প্রথম সংক্ষিপ্ত করে বলেন, ঈশ্বর হল সত্য। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর মত বদলে বলেন, সত্য হল ঈশ্বর। এর অর্থ সত্যই হল ঈশ্বরের ক্ষেত্রে গান্ধীজীর দর্শন।

অহিংসা

অহিংসার ধারণার বহিঃপ্রকাশ হিন্দু ধর্মীয় চিন্তাধারা এবং নিদর্শন হিসেবে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইহুদি এবং খ্রিস্টান বর্ণনায় পাওয়া যায়। গান্ধীজী তাঁর জীবনীতে বলেন: যখন আমি হতাশ হই, আমি স্মরণ করি সমগ্র ইতিহাসেই সত্য ও ভালবাসার জয় হয়েছে। দুঃশাসক ও হত্যাকারীদের কখনো অপরাজেয় মনে হলেও শেষ বিচারে সবসময়ই তাদের পতন ঘটে।

নিরামিষভোজন

শিশুকালে গান্ধীজী পরীক্ষামূলকভাবে মাংস খান। এটি হয়তো তার বংশগত কৌতূহল ও তার বন্ধু শেখ মেহতাবের কারণে হয়েছে। নিরামিষভোজনের ধারণা হিন্দু ও জৈন ধর্মে গভীরভাবে বিদ্যমান এবং তাঁর নিজের রাজ্য গুজরাটে বেশির ভাগ হিন্দুই নিরামিষভোজী। গান্ধীজীর পরিবারও এর ব্যতিক্রম ছিল না। লন্ডনে পড়তে যাবার আগে গান্ধীজী তাঁর মা পুতলিবাই এবং কাকা বেচারজি স্বামীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি মাংস খাওয়া, মদ্যপান এবং নারীসঙ্গ থেকে বিরত থাকবেন। তিনি এই প্রতিজ্ঞা পালন করেছিলেন এবং এর মাধ্যমে খাদ্যাভ্যাসের পাশাপাশি একটি দর্শন লাভ করেছিলেন। গান্ধীজী পরবর্তী জীবনে একজন পূর্ণ নিরামিষভোজী হয়ে ওঠেন। তিনি নিরামিষভোজনের ওপর 'দি মোরাল বেসিস অফ ভেজিটেরিয়ানিজম' বইটির পাশাপাশি এ বিষয়ে বেশ কিছু নিবন্ধ লেখেন। এই লেখাগুলোর কিছু কিছু ছাপা হয় লন্ডনের নিরামিষভোজী সংগঠন 'লন্ডন ভেজিটেরিয়ান সোসাইটি'র প্রকাশনা *দি ভেজিটেরিয়ান*-এ। গান্ধীজী এ সময় অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সঙ্গলাভ করেন

সবরমতী আশ্রম, গুজরাটে গান্ধীজীর একদা বাসভবন

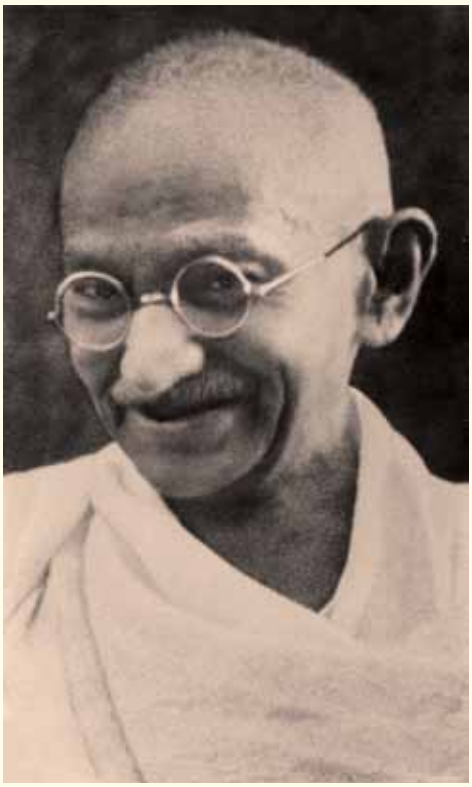

১৯৪০-এর দশকে মহাত্মা গান্ধী

নাম	মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
জন্ম	২রা অক্টোবর, ১৮৬৯ পোরবন্দর, গুজরাট, ব্রিটিশ ভারত
মৃত্যু	৩০শে জানুয়ারি, ১৯৪৮ নয়া দিল্লি, ভারত
মৃত্যুর কারণ	প্রতিহিংসাজনিত হত্যা
জাতীয়তা	ভারতীয়
অন্য নাম	মহাত্মা গান্ধী
শিক্ষা	ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন
যে জন্য পরিচিত	ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন
রাজনৈতিক দল	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস
ধর্ম	হিন্দু ধর্ম
দাম্পত্য সঙ্গী	কস্তুরবা গান্ধী
সন্তান	হরিলাল, মণিলাল, রামদাস ও দেবদাস
স্বাক্ষর	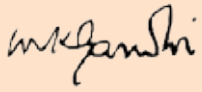

নয়াদিল্লিতে অবস্থিত মহাত্মা গান্ধীর বাসভবন গান্ধীস্মৃতি

এবং লন্ডন ভেজিটেরিয়ান সোসাইটির চেয়ারম্যান ড. জোসেফ ওল্ডফিল্ডের বন্ধু হয়ে ওঠেন।

হেনরি স্টিফেনস সল্টের লেখা ও কাজের পাঠক ও সমঝদার হয়ে ওঠা গান্ধীজী নিরামিষ খাওয়ার পক্ষে আন্দোলনকারীদের সঙ্গেও মাঝে মাঝে যোগ দেন। লন্ডন থেকে ফেরার পর গান্ধীজী নিরামিষ খাবার ব্যাপারে মানুষকে উৎসাহিত করেন। গান্ধীজীর মতে, নিরামিষ শুধু শরীরের চাহিদাই মেটায় না, এটি অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যও পূরণ করে, মাংস সাধারণত শস্যদানা, সবজি ও ফলের চেয়ে অধিক ব্যয়বহুল হয়। এছাড়াও সে-সময় অনেক ভারতীয়ই নিম্ন আয়ের হওয়ায় নিরামিষভোজন আন্দোলন কেবল আদর্শগত আন্দোলন না থেকে বাস্তব রূপও নিয়েছে। তিনি অনেক সময় ধরে খাওয়ার বিরোধিতা করেছেন, অনশন করাকে রাজনৈতিক প্রতিবাদ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তিনি তার দাবি আদায়ে আমরণ অনশনের প্রতিজ্ঞা করতেন। তাঁর জীবনীতে লেখা আছে, নিরামিষভোজনই ছিল ব্রহ্মচর্চায় তার গভীর মনযোগের সূচনা। মুখের উপর নিয়ন্ত্রণ না আনতে পারলে তার ব্রহ্মচার্য ব্যর্থ হতে পারত।

ব্রহ্মচর্য

গান্ধীজীর ষোল বছর বয়সে তাঁর বাবা ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। গান্ধীজী তাঁর বাবার অসুস্থতার পুরো সময় তার সঙ্গে ছিলেন। একরাতে গান্ধীজীর কাকা এসে তাঁকে বিশ্রাম নেবার সুযোগ করে দেন। তিনি তাঁর শয়নকক্ষে ফিরে যান এবং কামনার বশবর্তী হয়ে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত হন। এর সামান্য পরেই একজন কর্মচারী এসে তার পিতার মৃত্যু সংবাদ জানায়। তিনি এ ঘটনাটিকে দ্বিগুণ লজ্জা হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এই ঘটনাটি গান্ধীজীকে ৩৬ বছর বয়সে বিবাহিত থাকা অবস্থায় একজন ব্রহ্মচারী হতে বাধ্য করে। এই সিদ্ধান্তের পেছনে ব্রহ্মচর্যের দর্শন তাঁকে ব্যাপকভাবে প্ররোচিত করে, যা আদর্শগত ও বস্তুগত পবিত্রতার চর্চা করে। গান্ধীজী ব্রহ্মচর্যকে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ এবং আত্মোপলব্ধির পন্থা হিসেবে দেখতেন। গান্ধীজী তাঁর আত্মজীবনীতে তাঁর শৈশবের স্ত্রী কস্তুরবার সম্পর্কে তাঁর কামলালসা এবং হিংসার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার কথা বলেন। গান্ধীজী আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আদর্শ হবার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন যেন তিনি ভোগ করার বদলে ভালবাসতে শেখেন। গান্ধীজীর কাছে ব্রহ্মচর্যের অর্থ, 'চিন্তা, বাক্য ও কর্মের নিয়ন্ত্রণ'।

বিশ্বাস

গান্ধীজী হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং সারা জীবন হিন্দু ধর্মের চর্চা করেন। হিন্দু ধর্ম থেকেই তিনি তাঁর অধিকাংশ আদর্শ গ্রহণ করেন। একজন সাধারণ হিন্দু হিসেবে তিনি সকল ধর্মকে সমানভাবে বিবেচনা করতেন এবং তাঁকে এই ধারণা থেকে বিচ্যুত করার সব প্রচেষ্টা প্রতিহত করেন। তিনি ব্রহ্মবাদে আগ্রহী ছিলেন এবং সব বড় ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। হিন্দুবাদ সম্পর্কে তিনি নিচের উক্তিটি করেন: হিন্দুবাদ আমাকে পরিপূর্ণভাবে তৃপ্ত করে, আমার সম্পূর্ণ সত্তাকে পরিপূর্ণ করে...। যখন সংশয় আমাকে আঘাত করে, যখন হতাশা আমার মুখের দিকে কড়া চোখে তাকায়, এবং যখন দিগন্তে আমি একবিন্দু আলোও দেখতে পাই না, তখন আমি ভগবত গীতার দিকে ফিরে তাকাই এবং নিজেকে শান্ত করার একটি পঙ্‌ক্তি খুঁজে নিই; এবং আমি অনতিবিলম্বে অত্যধিক কষ্টের মধ্যেও হেসে উঠি। আমি ভগবত গীতার শিক্ষার কাছে কৃতজ্ঞ।

গান্ধীজী গুজরাটি ভাষায় 'ভগবত গীতা'র ভাষ্য রচনা করেন। গুজরাটি পাণ্ডুলিপিটি ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন **মহাদেব দাসী**। তিনি একটি অতিরিক্ত মুখবন্ধ ও ভাষ্য যোগ করেন। এটি গান্ধীজীর একটি ভূমিকাসহ ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হয়। গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন, প্রতিটি ধর্মের মূলে আছে সত্য ও প্রেম (করুণা, অহিংসা এবং **সোনালী** শাসন)। তিনি ছিলেন ক্লান্তিহীন সমাজ সংস্কারক এবং সব ধর্মের ভণ্ডামী, অপকর্ম ও অন্ধবিশ্বাসের বিপক্ষে। ধর্ম সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন: 'যদি আমি খ্রিস্টান ধর্মকে নিখুঁত এবং শ্রেষ্ঠতম ধর্ম হিসেবে মেনে নিতে না পারি, তবে হিন্দু ধর্মকেও সেভাবে মেনে নিতে পারি না। হিন্দুধর্মের ত্রুটিগুলি আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। যদি অস্পৃশ্যতা হিন্দু ধর্মের অংশ হয় তবে, এটি একটি পচা অংশ বা আঁচিল। বেদবাক্যগুলোকে ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত উক্তি বলার কারণ কি? যদি এগুলো অনুপ্রাণিত হয় তবে বাইবেল বা কোরান কেন নয়? খ্রিস্টান বন্ধুরা যেভাবে আমাকে ধর্মান্তরিত করতে প্রবল চেষ্টা করেছেন তেমনি মুসলিম বন্ধুরাও করেছেন। আবদুল্লাহ শেঠ ইসলাম চর্চা করার জন্য আমাকে প্ররোচিত করে চলেছেন এবং এর সৌন্দর্য সম্পর্কে সবসময়ই তার কিছু বলার থাকে।

যখনি আমরা নৈতিক ভিত্তি হারিয়ে ফেলি, আমরা ধার্মিক হওয়া থেকে ক্ষান্ত হই। নৈতিকতা হারিয়ে ধার্মিক হওয়া বলতে কিছু নেই। উদাহরণস্বরূপ, মানুষ মিথ্যাবাদী, নির্মম এবং আত্মসংযমহীন হয়ে দাবি করতে পারে না যে ঈশ্বর তার ভেতরে আছেন।

পরবর্তী জীবনে তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় তিনি হিন্দু কি না তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি তাই। এ ছাড়াও আমি একজন খ্রিস্টান, একজন মুসলিম, একজন বৌদ্ধ এবং একজন ইহুদি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গান্ধীজীর ভিতরে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা একাধিকবার নিজেদের মধ্যে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। এই বিতর্কগুলি সে-সময়কার জনপ্রিয়তম দুই ভারতীয়ের ভিতরে দার্শনিক মতভেদকে প্রমাণ করে। ১৯৩৪ সালের ১৫ জানুয়ারি বিহারে একটি ভূমিকম্প আঘাত করে এবং এটি ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও হতাহতের কারণ হয়। গান্ধীজী বলেন, এটি হবার কারণ হল উঁচুশ্রেণীর হিন্দুদের অস্পৃশ্যদের তাদের প্রাসাদে ঢুকতে না দেবার পাপের ফল। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর এই মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, ভূমিকম্প কেবল প্রাকৃতিক কারণেই সংঘটিত হতে পারে, অস্পৃশ্যতার চর্চা যতই বেমানান হোক না কেন।

সরলতা

গান্ধীজী প্রবলভাবে বিশ্বাস করতেন যে, সামাজিক কাজে নিয়োজিত একজন ব্যক্তি অবশ্যই সাধারণ জীবন যাপন করবে যেটা তার মতে তাকে ব্রহ্মচর্যের পথে নিয়ে যাবে। তাঁর সরলত্বের সূচনা ঘটে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাপিত পশ্চিমা জীবনাচরণ ত্যাগ করার মাধ্যমে। তিনি এটিকে 'শূন্যে নেমে যাওয়া' হিসেবে আখ্যায়িত করেন যার মধ্যে ছিল অপ্রয়োজনীয় খরচ কমানো, সাদামাটা জীবনযাপন এবং নিজের কাপড় নিজে ধোয়া। একবার তিনি নাটালদের দেওয়া উপহার ফিরিয়ে দেন।

সূত্র: ইন্টারনেট

রাজঘাট: আগা খান প্রাসাদে গান্ধীজীর দেহভস্ম (পুনে, ভারত)

গান্ধীনীতি
পূর্ব থেকে পশ্চিম

আনারুল হক আনা

১৯৪২ সালে অন্নদাশংকর রায়ের সঙ্গে আলোচনায় জনৈক আইরিশ বংশোদ্ভুত ব্রিটিশ গোয়েন্দা কর্মকর্তা গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলন সম্পর্কে বলেন, His all ideas are right. But he is two hundred years in advance of his time। গান্ধীজী বর্ণবাদমুক্ত যে স্বাধীন ভূমি চেয়েছিলেন, তা এখনও হয়ে ওঠেনি। নতুন শতাব্দীতে ধর্মভিত্তিক সামাজিক বর্ণবাদের তীব্রতা কমলেও আবিষ্কৃত হয়েছে গোষ্ঠীগত বিভেদের নতুন মেরুকরণ। ধর্ম এখানে বিষয় নয়– পেশা ও অর্থনীতি হল নাগরিক মর্যাদার অলিখিত মাপকাঠি। এর প্রতিকারের কথা ছিল জ্ঞানধাত্রী প্রতিষ্ঠানগুলোর। অথচ সেগুলোও আজ ভজন-তোষণের সূতিকাগার। নজরুল গবেষক ড. আজমল খানের ভাষায়, Master শব্দের অনেক অর্থ আছে, তাদের মধ্যে দুটো হচ্ছে পণ্ডিত ও প্রভু। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পণ্ডিত নয়, প্রভু তৈরি করছে।

বিভিন্ন ভাষায় প্রভু-ভজনের শ্রুতিসুখকর অনেক শব্দ বিদ্যমান। তবে উপমহাদেশে সবচেয়ে ক্রিয়াশীল স্যার। খুব সূক্ষ্ম প্রক্রিয়ায় এ শব্দটা রাষ্ট্রীয় সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে প্রভু ও দাসত্বের সম্পর্ক নির্ণয়ে সক্ষম। মানুষের সেবা কাজে নিয়োজিত দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা নিজেদের স্যার শুনতে বেশি আগ্রহী। সব নাগরিকই রাষ্ট্রের সমান মালিক। এখানে কেউ কারো দাস বা প্রভু নয়। যে যেমন দায়িত্ব পালন করবে, সে তেমন মজুরি পাবে। অথচ স্যার হবার প্রবল আগ্রহে একাডেমিক সনদপ্রাপ্তরা সেদিকেই ছুটছেন। এসব মেধাবী সনদপ্রাপ্তরা যদি জীবনের গতিময় শক্তিকে অপচয় না করে কৃষি বা অন্য শ্রমে যেতেন, দেশের সার্বিক উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেত।

ভজন-তোষণের সমৃদ্ধির যুগে ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির স্বপ্রণোদিত একটি পরামর্শ নতুন আশার সঞ্চার করে। তাঁর সাফ কথা, তাঁর নামের সঙ্গে মাননীয়, হিজ এক্সেলেন্সি শব্দগুলো ব্যবহার করা যাবে না। এ শব্দবন্ধে হয়তো তিনি প্রাচীন ভাবধারার চেতনা থেকে প্রভুত্ববাদ মুছে ফেলতে চেয়েছেন। তবে ব্যক্তির কর্ম যখন সর্বজনীন হয়ে ওঠে, তখন তা আর নির্দিষ্ট ভূগোলের সীমায় বন্দী থাকে না। ক্রমসম্প্রসারণে হয়ে যায় সবার কিংবা সমগ্র বিশ্বের। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর অহিংস আন্দোলন মহাসাগর পার হয়ে চলে যায় আমেরিকা-ইউরোপে। সাদা-কালো সমতাভিত্তিক মার্কিন সমাজ নির্মাণের শ্রমিক মার্টিন লুথার কিংয়ের কাছে গান্ধীজীর অহিংসবাদ হয়ে উঠেছিল হাতিয়ার। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর আহ্বানে ১৯৫৯ সালে ভারতে এসে এ মানবতাবাদী মানুষটি বিশ্ব মানবতাবাদের শিক্ষক মহাত্মা গান্ধীর জন্মস্থানে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

গান্ধীজী চেয়েছিলেন ঔপনিবেশিক দাসত্বের পরিবর্তে স্বরাজ। স্বরাজের সঙ্গে ভারতবর্ষের বর্ণবাদহীন সামাজিক বিন্যাস। স্বরাজ প্রতিষ্ঠায় প্রথমে কংগ্রেসকে হাতিয়ার মনে করলেও পরবর্তীকালে অবস্থানের পরিবর্তন করেন তিনি। হিন্দু, ইসলাম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন সকল ধর্মকে আদর্শের জায়গায় ঠিক রেখে তিনি বর্ণবাদের অবসান চেয়েছিলেন; চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের বৃহৎ জনগোষ্ঠী হিন্দুসমাজের কাঠামোগত সংস্কার। তাঁর অস্ত্র তখন কংগ্রেস নয়; মানবিক শক্তি। তবু বর্ণবাদকে ধারণ করেই স্বরাজ পায় ভারত। স্বাধীন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে আসে কংগ্রেস। গান্ধীজীর নীতি উপেক্ষা করে ভারতবর্ষের শরীরে ভাগের আল উঠে দুটো স্বাধীন দেশের পতাকা ওড়ে। গান্ধীবাদ উপেক্ষিত হলেও স্বাধীন ভারতে গান্ধীজী পরম শ্রদ্ধাভাজন মানুষ। সে কারণে তাঁকে সক্রেটিসের পরিণতি বরণ করতে হয়নি। তারপরও ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি পিস্তলের গুলি নিভিয়ে দেয় পৃথিবীবাসীর এ আশার আলো। মহাত্মার শেষ উচ্চারণ ছিল, 'হে রাম'।

তাঁর চেতনা ধারণ করে অহিংসবাদী মার্টিন লুথার কিং ১৯৬৮ সালের ৪ এপ্রিল ট্রেডিশনবাদীদের হিংস্র বুলেটে ইতিহাস হয়ে গেলেন। সময়ের ব্যবধান বিশ বছর। ভূগোলের অবস্থান পূর্ব আর পশ্চিম হলেও ঘটনার মৌলিক উপাদান একই। ১৮৬৫ সালে আব্রাহাম লিংকনের পরিণতি আর ১৯৬৩ সালের জন এফ কেনেডির ট্রাজেডি ভিন্ন বিবরণের প্রতিবেদন নয়। বর্ণবাদ বিরোধী মানবতার সাধনায় জীবন দুটি থেকে আততায়ীর গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। আজকের বিশ্ব বলছে, ঐ খুনগুলি ছিল চরম বর্বরতা। মানব সভ্যতার কলংকের ইতিহাস। তাই যদি হয়, তাহলে জনঅরণ্যে এখনও কেন বর্ণবাদের আস্ফালন দেখছি?

বর্ণবাদের নির্যাতন চরমে পৌঁছলেও নেলসন ম্যান্ডেলার পরিণতি ঐ রকম হয়নি। তাঁর পার্থিব জীবনেই আপনভূমির মালিকানা ফিরে পায় কালোরা। এ ইতিহাস নির্মাণের সূচনায়ও ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। সাদাদের নির্যাতন থেকে মুক্তির জন্যই দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতের এ গুজরাটী ব্যারিস্টার গুজরাটী ভাষায় 'হরতাল' নামে অসহযোগ আন্দোলনে ডাক দিয়েছিলেন মানুষকে। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন নেলসন ম্যান্ডেলার নেতৃত্বে কালোরা নিজের দেশের মালিকানা ফিরে পেল, দুর্ভাগ্য এই, তার চার দশক আগেই গান্ধীজীকে স্বর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গান্ধীজীর তিরোধানের প্রায় সাত দশক পর খণ্ডিত ভারতবর্ষের আজকের ভারতে বর্ণবাদ এখন কোন পর্যায়ে? প্রথম নাগরিক প্রণব মুখার্জির ভাবগম্ভীর উচ্চারণ যথেষ্ট ইঙ্গিতবাহী। ভারত তার সামাজিক শরীর থেকে বর্ণবাদ মুছে ফেলতে চাইছে। ভারতীয়রা 'তুই' 'আপনি' সম্বোধনের বিলুপ্তি ঘটিয়ে এখন শুধুমাত্র 'তুমি' স্থায়ী করার চেষ্টা করছেন। এ প্রচেষ্টা তাদের এনে দিচ্ছে অর্জনের সাফল্য। তারা কৃষি, শিল্প, প্রযুক্তি, পেশীতে অগ্রগামী। মঙ্গল গ্রহ মিশনের সাফল্য বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। সাফল্যের ফিরিস্তি এখানেই শেষ নয়। ভারতের চিকিৎসকেরাই বাংলাদেশীদের আস্থার ঠিকানা। আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, জনসম্পদ তৈরিতে উপমহাদেশে ভারত শীর্ষে। যুক্তরাজ্যের লন্ডনভিত্তিক প্রতিষ্ঠান *টাইমস হায়ার এডুকেশন*-এর ঘোষণায় এই সত্যতা উঠে এসেছে। শিক্ষার মান, গবেষণাসহ শিক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন মানদণ্ড পরিমাপ করে ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠানটি এশিয়ার সেরা ১০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা প্রকাশ করে। চিন-জাপানের প্রাধান্য থাকলেও সেখানে ভারতের ৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থান পেয়েছে। ২০১৩ সালে কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিংয়ে ৩০০ এশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় ছিল বাংলাদেশের শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এ তালিকায় ভারতের ছিল ১১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ পরিসংখ্যান আমাদের আরো বার্তা দিচ্ছে, যারা স্বপ্রভুত্ব বিসর্জন দিয়ে সিটিজেন স্ট্যাটাসকে সাম্যের বিবেচনায় নিয়ে আসছে, তারাই সব ক্ষেত্রে ক্রমশ সমৃদ্ধির শিখরে আরোহণ করছে। প্রভুত্ব ভাবনা বিসর্জন দিয়ে এগিয়ে আছে ভারত। ফলে উন্নতির প্রথম র‍্যাংকিংয়েই ভারতের অবস্থান। অথচ বর্তমান ভারতের ভৌগোলিক সীমায় প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মাঝে স্তরের বীজ রোপণ করেছিল ভিনভূমি থেকে আসা আর্যরা। তারপর যুগের নতুন নতুন পাটাতনে ধর্মের অপব্যাখ্যা, পবিত্র গ্রন্থে নিজেদের মত সংযোজন আর কৌশলের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয় নতুন নতুন শ্রেণিবিন্যাস। অবশেষে উনিশশো সাতচল্লিশে নিজ ভূমির মালিকানা পেয়ে ঘুরে দাঁড়ায় ভারত। এ-ক্ষেত্রে শীর্ষে আছে বিদগ্ধ জ্ঞানী-পণ্ডিতদের অবদান অনস্বীকার্য।

আমেরিকার বর্ণবাদ অবসানের অগ্রগামী প্রতীক যদি হন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, তাহলে গান্ধীজী তার নিউক্লিয়াস। বীরত্বের খেতাবে চলে আসেন মার্টিন লুথার কিং। ইতিহাসের আগের পাতার সোনালি লিপি আব্রাহাম লিংকন, জন এফ কেনেডি। সাদা হয়েও কালোদের প্রতি জীবনাভূতি তাঁদের পৌঁছে দিয়েছে বিশ্ব মানবতার চূড়ায়। শুধুমাত্র উপমহাদেশ, আফ্রিকা কিংবা আমেরিকা গিয়েই গান্ধীজীর অহিংসবাদের

যবনিকা ঘটেনি। অহিংস তত্ত্বের দেশ-কাল নেই। ইসলাম, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, ইহুদি সবখানেই গান্ধীজীর অহিংস নীতির বিচরণ। আমেরিকার একটি খ্রিস্টান গোষ্ঠীর মুখপত্রের নাম 'ক্যাথলিক ওয়ার্কার'। ১৯৬৯ সালে অন্নদাশংকর তথ্য দিচ্ছেন, এ ক্যাথলিকরা প্রায়ই দৃষ্টান্তে গান্ধীকে আনেন। কারণ আবিষ্কার করে দেখা যায়, তাঁরা মনে করেন, গত কয়েকশো বছরে গান্ধীজীর ধারেকাছে দাঁড়াবার মত কোন খ্রিস্ট শিষ্য নেই। তাই গান্ধীজীকেই তাঁরা আধুনিক পথপ্রদর্শক হিসেবে বেছে নেন।

গান্ধীজীর অহিংস তত্ত্বটা আসলে কী? এর মৌলিক উপকরণ ধৈর্য। তার সঙ্গে আছে আধ্যাত্মিক চেতনা, বিশ্বাস, মানবিক মূল্যবোধ, সাহস, কৌশল, লক্ষ্য, পরিকল্পনার সমন্বয়। গান্ধীজী কঠোর সাধনায় ব্যক্তিজীবনে এসবই নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে পেরেছিলেন। একটা ঘটনা উপস্থাপন করলে তাঁকে চেনা সহজ হবে। ইংল্যান্ডে ডাক্তার সাবারকরের সঙ্গে গান্ধীজীর একবার হিংসা-অহিংসা নিয়ে কথা ওঠে। গান্ধীজী তখন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ইল্যান্ড গিয়েছেন ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কথা বলতে। মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে বিস্তার না ঘটলেও সত্যাগ্রহ বা অহিংস আন্দোলনের কুঁড়ি তখন বিকশিত হতে শুরু করেছে। ইংল্যান্ডের মাটিতে বসে তর্কের এক পর্যায়ে ডা. সাবারকর গান্ধীজীকে প্রশ্ন করেন, 'মনে করুন একটা বিষধর সাপ আপনার দিকে তেড়ে আসছে। আপনার হাতে আছে একগাছা লাঠি। আপনি কি করবেন? মারবেন, না মরবেন না?' গান্ধীজীর উত্তর ছিল, 'লাঠিখানা আমি ছুঁড়ে ফেলে দেব। পাছে আমার মারবার প্রলোভন জাগে।'

পশ্চিমা প্রভুরা বুঝে গিয়েছিলেন, ভারতবাসীর সব অস্ত্র ধ্বংস করা গেলেও গান্ধীজীর আধ্যাত্মিক ও মানবিক অস্ত্র ধ্বংস করা যাবে না। অন্নদাশংকরের ভাষায়, 'এবার তাঁরা জানলেন যে, সব হাতিয়ার বাজেয়াপ্ত করলেও একটি হাতিয়ার থেকে যায়, সেটির নাম হাতিয়ার না থাকা। তা থেকে কোন মানুষকে বঞ্চিত করা যায় না। ভারতের জনগণ সেই প্রথম ইতিহাসের মঞ্চে প্রবেশ করে। তাদের ডাক দিয়ে নিয়ে আসেন এক অসাধারণ তেজস্বী নেতা। তাঁর হাতে একটিমাত্র অস্ত্র। তার নাম নিরস্ত্রতা। সেই অসামান্য অস্ত্রই তিনি জনগণের হাতে ধরিয়ে দেন।'

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে তিনি দেশে ফেরেন। এর মধ্যে পঁচিশ বছরই তাঁর কাটে বিদেশে। তখন দক্ষিণ আফ্রিকাও ছিল ইউরোপীয় শাসনাধীন। তিনি ভারতের বাইরে ইউরোপ বা ইউরোপীয় উপনিবেশে পঁচিশ বছর অতিবাহিত করেন। দীর্ঘদিন ইউরোপীয়দের সঙ্গে থেকে ভারতে ফেরার পাঁচ বছর আগে লেখেন 'হিন্দ স্বরাজ'। এ 'হিন্দ স্বরাজ'ই ছিল তাঁর অহিংস বা সত্যাগ্রহ বা স্বরাজ প্রতিষ্ঠার ঘোষণাপত্র। ভারতে ইংরেজ সরকার বইটি নিষিদ্ধ করে। দেশে ফিরে নেতৃত্ব গ্রহণের পর গান্ধীজী সরকারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেন। বইটি পড়ে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রুশ ঔপন্যাসিক লিও টলস্টয় আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, একদিন শুধু খ্রিস্টান দেশগুলো নয়, পৃথিবীর সব জাতিই আপনার চিন্তাধারা গ্রহণ করবে। গান্ধীজীর কাজই পৃথিবীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে টলস্টয় মনে করেছিলেন।

গোল টেবিল বৈঠকের জন্য গান্ধীজী বিলেতে গিয়েছিলেন এবং ছিলেন তিন মাস। সেখানেও তিনি আধা-উলঙ্গ অবস্থায় ধুতি পরে থাকতেন। আবাস বেছে নিয়েছিলেন ইস্ট এন্ডের গরিবপাড়ার কিংসলি হল নামে একটি সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানে। দিনের আহারের ব্যবস্থা করেছিলেন মাত্র দেড় সিলিং বা এক টাকার মধ্যেই। কাজের জন্য নাইটসরিজ এলাকায় ছোট্ট একটা অফিস রেখেছিলেন। অনেক প্রসিদ্ধ মানুষ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন জর্জ বার্নাড শ'। তিনি গান্ধীজীকে বলতেন মহাত্মা মেজর এবং নিজেকে বলতেন মহাত্মা মাইনর।

গান্ধীজী গিয়েছিলেন বাকিংহাম প্রাসাদে। সে রাজপ্রাসাদেও তাঁর পোশাকের পরিবর্তন দেখা যায়নি। কথা হয় রাজা পঞ্চম জর্জের সঙ্গে। রাজার প্রভুত্ববাদী আচরণে প্রথমে নীরব থাকলেও এক সময় নম্র অথচ দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করেন গান্ধীজী। রাজা বলেন, 'দক্ষিণ আফ্রিকায় আপনাকে আমি দেখেছি। তখন ও তারপরেও ১৯১৮ সাল পর্যন্ত আপনি ভাল মানুষ ছিলেন। পরে আপনার মধ্যে কিছু একটা বিগড়ে যায় বলে মনে হয়।' এ-সব শুনেও গান্ধীজী নীরব ছিলেন। রাজা যখন ভারত শাসননীতি সম্পর্কে বলেন, 'বিদ্রোহ বরদাস্ত করা হবে না, দমন করা হবে, রাজসরকারকে চালু রাখতে হবে', তখন বিগড়ে যান গান্ধীজী। শান্ত, ধীর কিন্তু কঠোর মনোবলে তিনি প্রতিবাদ করেন। ব্যক্তিচরিত্রের সমালোচনা নীরবে সহ্য করেছিলেন গান্ধীজী; তবে স্বরাজের বিরুদ্ধবাদ নয়।

চার্চিলের সঙ্গেও দেখা করতে চেয়েছিলেন গান্ধীজী, তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন চার্চিল। সেই চার্চিলের এক সম্পর্কিত বোন ক্লেয়ার শেরিডান স্বেচ্ছায় গান্ধীজীর মূর্তি মডেল করেন। সে উদ্দেশ্যে ক্লেয়ার শেরিডান দ্বারস্থ হয়েছিলেন সরোজিনী নাইডু নামে আরেক প্রসিদ্ধ মানবীর কাছে। তারপরও গান্ধীজীর শর্ত ছিল তিনি পোজ দিতে পারবেন না। শেরিডান তার এগারো বছর আগে ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের মূর্তিও মডেল করেছিলেন। তাঁরও শর্ত ছিল অভিন্ন। মতবাদে ভিন্ন হলেও লেনিনের মৃত্যুর কিছু দিন পর এই দুই মানবতাবাদীর নামে এক মলাটে একটি বই প্রকাশিত হয়। বইটির শিরোনাম ছিল 'লেনিন ও গান্ধী'। যার লেখক রেনে ফ্যু এলপ-মিলার নামে এক অস্ট্রিয়ান। সে-যুগে বিশ্বে সততা ও নীতির ক্ষেত্রে আপসহীন চরিত্রের আলোকিত মানুষ আর হয়তো কেউ ছিলেন না।

ইংল্যান্ডের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র গান্ধীজীকে গ্রহণ না করলেও ইউরোপীয় ধার্মিকেরা পরম শ্রদ্ধায় আপন করে নেন। মড রয়ডেনের মতে, তিনি শ্রেষ্ঠ খ্রিস্টান। আর্নেস্ট বারকার তাঁকে মনে করেছিলেন, এ যুগের সেন্ট ফ্র্যান্সিস তথা সেন্ট টমাস একুইনাস। তাঁর মধ্যে যেন ছিল দুয়ের সমন্বয়; তেমনি কাজেও প্র্যাকটিক্যাল। অক্সফোর্ডের শিক্ষকরা তিন ঘণ্টা পরীক্ষা করেন গান্ধীজীকে। ঐ শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন বেলিয়লের অধ্যক্ষ গিলবার্ট মারে, মাইকেল স্যান্ডলার, পিসি লায়ন। তাঁরা তাঁকে সক্রেটিসের মত স্থিতিপ্রজ্ঞ বলে মানেন, যিনি হেমলক পানের সময়ও নির্বিকার থাকেন।

তিনমাস বিলাতবাসের পর বাড়ি ফেরার পথে সুইজারল্যান্ডের ভিলেনুভ গাঁয়ে যান গান্ধী। উদ্দেশ্য ফরাসি বিপ্লবের মানসপুত্র রমা রলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ। রলাঁর শোবার ঘরের দেয়ালে তখন দৃশ্যমান গ্যেটে, বেঠোফেন, টলস্টয়, গোর্কি, রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইন, লেনিন ও গান্ধী। জীবন্ত লেনিন তখন পৃথিবীতে নেই। রলাঁর বাড়িতে পাঁচ দিন ছিলেন গান্ধীজী। তারপর স্টেশনে গিয়ে তাঁর প্রিয় বিশ্বআলোকবর্তিকাকে বিদায় দেন রলাঁ। আগমনের সময় অসুস্থতা সত্ত্বেও স্টেশনে গিয়ে গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন রলাঁ। সাক্ষাতের আট বছর আগে 'মহাত্মা গান্ধী' লিখে গান্ধীজীকে পৃথিবীখ্যাত করেন রলাঁ। সেখানে একসঙ্গে থাকা পাঁচ দিনের স্মৃতিচারণ ছিল অনেক। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের মুহূর্তে রলাঁ উচ্চারণ করেছিলেন, 'আমার তো ভয় হচ্ছিল যে এ জীবনে বুঝি আপনার সঙ্গে দেখা হবে না। তাঁর আগেই চলে যেতে হবে।' আবার দুঃখও প্রকাশ করেন লেনিনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ না হওয়ায়। গান্ধী ও লেনিনের দৃশ্যমান চরিত্র সম্পর্কে রলাঁ বলেন, 'লেনিন আপনার মতই কোনদিন মিথ্যের সঙ্গে আপস করেননি'।

ভ্যাটিকানের পোপ গান্ধীজীকে সাক্ষাৎ দেননি। তবে তাঁর সম্মানে ভ্যাটিকানের গ্যালারিগুলো খুলে দেওয়া হয়েছিল। মুসোলিনির সঙ্গে সাক্ষাতে স্পষ্ট কটাক্ষ ছিল গান্ধীজীর, 'তিনি শুধু একট তাসের কেল্লা নির্মাণ করছেন।'

গান্ধীজী কাউকে ধর্মান্তরের পরামর্শ দেননি। মনে-প্রাণে নিজে হিন্দু ছিলেন। ঈশ্বর প্রদত্ত সকল ধর্মের প্রতি ছিলেন আস্থাশীল। হিন্দু ছাড়াও তাঁর আশ্রয়ে মুসলমান, খ্রিস্টান, পারসিয়ান থাকতেন। তাঁদের ধর্ম পরিবর্তনের অনুমতি দেওয়া হয়নি। নিজ ধর্ম গ্রন্থকে খুঁটিয়ে পড়ার বিষয়ে তিনি উৎসাহ দিতেন; ধর্মের প্রতি ভালবাসা, সহানুভূতি, চর্চার বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। মিস স্লেড নামে এক ইউরোপীয় গান্ধীজীর আশ্রমে এসে নিজের নাম বদলে ফেলে রাখেন মীরাবাঈ। এ ঘটনায় বিলেতি খবরের কাগজগুলো সমালোচনামূখর হয়ে ওঠে। তারা প্রচার করে, মিস স্লেড হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছেন। মিস স্লেড তখন বিশের সীমানা পেরিয়ে গেছেন। তিনি শুধু মানুষ নয়; গাছ-প্রাণির সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক নির্ণয়ের উদ্দেশে মিশর, ফ্রান্সসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। এ ব্যাপারে গান্ধীজীর মন্তব্য ছিল, 'মিস স্লেড হিন্দু নাম গ্রহণ করেননি, ভারতীয় নাম নিয়েছেন। তাঁকে ডাকা ও অন্যান্য সুবিধার জন্যই এ নাম রাখা হয়।' এই হলেন মহাত্মা।

আনারুল হক আনা
প্রাবন্ধিক

মহীশূরু বিশ্ববিদ্যলয়

১০৩তম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে উদ্বোধনী ভাষণরত ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি

বিজ্ঞান

১০৩তম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

তপন চক্রবর্তী

এ বছরের শুরুতে ০৩-০৭ জানুয়ারি ভারতের অন্ধ্র রাজ্যের তৃতীয় বৃহত্তম নগরী মহীশূরে ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশনের ১০৩তম বিজ্ঞানী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এবারের সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'ভারতের উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি'। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশন ভারতের প্রধান বিজ্ঞান সংঘটন। এর সদর দপ্তর ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায়। ১৯১৪ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ রসায়নশাস্ত্রবিদ প্রফেসর জে এল সিমোনসেন ও প্রফেসর পি এস ম্যাকমোহন এই প্রতিষ্ঠানের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং তাঁদেরই উদ্যোগে সংঘটনটি গড়ে ওঠে। তাঁরা ভারতে বিজ্ঞানের উন্নয়নকল্পে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন ফর অ্যাডভান্সমেন্ট অফ সায়েন্স-এর মত একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সমিতির সদস্যরা নিয়মিতভাবে প্রতি বছর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে একবার মিলিত হয়ে বিজ্ঞানের নানা অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। দেশ-বিদেশের প্রায় ৩০ হাজার বিজ্ঞানী এই প্রতিষ্ঠানের সাধারণ ও জীবন সদস্য। প্রতি বছরই বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সমসাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার লক্ষ্যে সমাবেশের

সমবেত ভারতীয় ও বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানীদের মাঝখানে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি

আয়োজন করা হয়। প্রসঙ্গের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিজ্ঞানের নানা শাখায় সেমিনার, কর্মশালা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য:

১. ভারতে বিজ্ঞানের অগ্রগতিসাধনে প্রয়াস গ্রহণ;
২. ভারতে উপযুক্ত কোন স্থানে বছরে একবার মিলিত হওয়া;
৩. কংগ্রেসের কার্যক্রম, সাময়িকী, পারস্পরিক মত-বিনিময় ও অন্যান্য প্রকাশনার ব্যাপারে আলোচনা;
৪. বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য তহবিল সংগ্রহ এবং প্রয়োজনে সমিতির সম্পদ বিক্রি এবং
৫. উপরোল্লিখিত লক্ষ্য অর্জনে যে কোন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

১৯১৪ সালে কলকাতায় সমিতির প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। সেই অধিবেশনে উদ্ভিদবিজ্ঞান. রসায়নশাস্ত্র, মানবজাতির উদ্ভব ও বিকাশের বিবরণ, ভূবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞানবিষয়ক গবেষণাপত্র উপস্থাপিত হয়েছিল।

উল্লেখ্য যে, ভারতের স্বাধীনতার পর থেকে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশন বিদেশের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান যেমন আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ অ্যাডভান্সমেন্ট অফ সায়েন্স, ফ্রেঞ্চ একাডেমি অফ সায়েন্সেস, বাংলাদেশ একাডেমি অফ সায়েন্স ও শ্রীলঙ্কা অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অফ সায়েন্সসের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে তথ্য ও উপাত্তের আদান-প্রদান করে চলেছে।

১৯৬৫ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী বিজ্ঞান কংগেসের উদ্বোধনী ভাষণে 'জয় জোয়ান, জয় কিষাণ' স্লোগান দিয়েছিলেন। তাঁর মতে একটি দেশ সামরিক শক্তি ও কৃষির বিকাশ ছাড়া উন্নত হতে পারে না। ১৯৯৮ সালে পোখরানে আণবিক পরীক্ষার পর ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর 'জয় জোয়ান, জয় কিষাণ' স্লোগানের সঙ্গে 'জয় বিজ্ঞান' যোগ করেন। অটলজীর বক্তব্য ছিল এটি সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে একটি দেশকে স্বনির্ভর হতে হলে দেশটিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধন করতে হবে। তাহলে ভারত উন্নত দেশের সঙ্গে পা মিলিয়ে পাশাপাশি চলতে পারবে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, পৃথিবীতে ভারতই একমাত্র দেশ যেখানে গণতন্ত্র, বিচিত্র জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতি ও চাহিদার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। এ কারণে, তিনি বিদেশী বিনিয়োগকারীদের ভারতীয় অর্থনীতিকে 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র মোড়কে বৈশ্বিক স্বীকৃতিদানের আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, সরকার তৈজস উৎপাদনে দক্ষ জনশক্তি নিশ্চিতভাবে লভ্য করার জন্য প্রয়াস গ্রহণ করেছেন। শুধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভারতে চাকরির বাজার তৈরি করতে পারে। তাঁর প্রদত্ত স্লোগান কেবল ভারতে উৎপাদনের জন্য নয় ভারতীয়দের জন্যও উৎপাদন বটে। ভারত এখনও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পরিবর্তে প্রযুক্তি আমদানি-নির্ভর। কাজেই ভারতকে কৌশলগত ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ওপর অধিক জোর দিতে হবে যাতে দেশীয়ভাবে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ভারতের এবং বৈশ্বিক প্রযুক্তিকে রূপান্তরসাধনে সহায়তা করতে পারে। ফলে মেড ইন ইন্ডিয়া স্লোগানও বাস্তবে রূপ নিতে পারবে। তাঁর মতে, এই রূপকল্প রূপায়ণে প্রায়োগিক গবেষণাকে প্রশিক্ষণ স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন।

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, পৃথিবীর কাছে এই প্রযুক্তি তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যদি তা বিদ্যমান প্রযুক্তির চেয়ে ব্যাপক হারে অধিকতর সহজলভ্য হয়। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতার সময় থেকে ভারতের বিজ্ঞানচর্চার সুমহান ঐতিহ্য ছিল। তখনই ভারত দৈর্ঘ্য, ভর ও সময়ের পরিমাপ জানত। এই সভ্যতাই পৃথিবীকে সমরূপ ওজন ও পরিমাপ পদ্ধতি উপহার দিয়েছে। মানুষ সেই সময় ধাতু মিশ্রণের কৌশল উদ্ভাবন করেছে এবং তামা, ব্রোঞ্জ (তামা ও টিনের মিশ্রণে নির্মিত), সিসা ও টিনের ব্যবহার চালু করে।

কংগ্রেসে আগত নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী

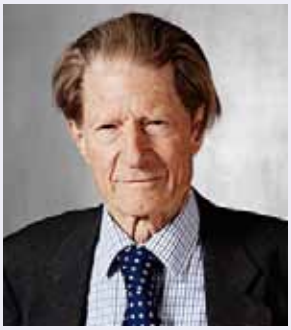

জন গুর্ডন
বিশিষ্ট গ্রুপ নেতা
ওয়েলকাম ট্রাস্ট/ক্যান্সার রিসার্চ
গুর্ডন ইনস্টিটিউট, যুক্তরাজ্য

প্রফেসর মঞ্জুল ভার্গব
অঙ্কশাস্ত্রবিদ
ফিল্ড মেডালিস্ট, প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়
নিউ জার্সি, যুক্তরাষ্ট্র

প্রফেসর ডেভিড জে ক্রশ
ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
কাভলি ইনস্টিটিউট ফর থিওরিটিক্যাল
ফিজিক্স, সান্তা বারবারা, সিএ,যুক্তরাষ্ট্র

প্রফেসর ড্যান শেইচম্যান
ফিলিপ টোবিয়াস প্রফেসর অফ ম্যাটে-
রিয়াল সায়েন্স
ডিপার্টমেন্ট অফ ম্যাটেরিয়াল
সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনিয়ন
ইসরায়েল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি

প্রফেসর সার্জ হোরেসে
কলেজ ডি ফ্রান্স
প্যারিস, ফ্রান্স

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ভারত বড় বড় পদক্ষেপ নিয়েছে যা এর জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের উপর ছাপ ফেলেছে। বিভিন্ন ধরনের ভ্যাকসিন তৈরি থেকে বংশগতভাবে রূপান্তরিত শস্য, টিস্যু কালচার, আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথি, প্রাকৃতিক চিকিৎসা আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র, উপগ্রহ 'আর্যভট্ট' ইত্যাদি ভারতের উল্লেখযোগ্য অর্জন। ভারত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বহু দেশের থেকে যে উন্নত তা আবারও প্রমাণ করেছে। ভারতের বিজ্ঞানের পালকে যুক্ত হয়েছে মঙ্গলায়ন প্রযুক্তির সাফল্য। ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন (ইসরো) সোভিয়েত রাশিয়া, আমেরিকার ন্যাশন্যাল অ্যারোনটিক এন্ড অ্যাডমিনেস্ট্রেশন (নাসা) ও ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সির পর প্রথমবারেই আন্তঃউপগ্রহ মিশনে প্রথম প্রচেষ্টায় মঙ্গল গ্রহের কক্ষে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। এই উল্লম্ফন ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভারতকে অন্য গ্রহে প্রেরণ করেছে। সেদিন বেশি দূরে নয় ভারত স্বীয় প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের ডানায় ভর করে নূতন উচ্চতায় পৌঁছে যাবে।

তিনি উপসংহারে বলেন যে, ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশনকে (ইসকা) অবশ্যই শিক্ষক, প্রশিক্ষক, শিক্ষা প্রশিক্ষক, গবেষক ও বিদ্বৎসমাজ ও শিক্ষার্থীদেরকে স্বদেশে আবিষ্কার ও উদ্ভাবনে এবং ভারতের লাগসই অগ্রগতিতে অবদান রাখায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত সাধারণ মানুষকে স্বদেশে আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভারতের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে যে ভূমিকা পালন করছে তা বুঝতে হবে এবং এতে প্রণোদনা যোগাতে হবে। বিজ্ঞানের ভূমিকা জানা না থাকলে কোন জিনিস তৈরি করা বা কোন সার্ভিস দেওয়া সম্ভব হবে না। যদি এর পেছনের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পুরো জানা থাকে তাহলে জিনিসটি সহজে ও সাশ্রয়ী মূল্যে উৎপাদন করা সম্ভব হবে। যদি নিজেরা এর নকশা তৈরি করে প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা যায় তাহলেই কেবল তা সম্ভব। যে-কোন উৎপাদিত দ্রব্য যদি স্বীয় উদ্ভাবিত প্রযুক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাহলে বুদ্ধিবৃত্তিক স্বত্বের (intellectual right) জন্য প্রদেয় বিশাল অংকের রুপির সাশ্রয় হবে। ভারতের প্রয়োজনমাফিক জিনিস যদি উৎপাদন করা যায় তাতেও আমদানি-নির্ভরতা কমবে এবং ভারত অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে। ভারতে উৎপাদিত পণ্যের পাশাপাশি ভারতীয় উদ্ভাবন ও আবিষ্কার একে-অপরের হাত ধরে চললে ভারত নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়াতে পারবে এবং পরাশক্তিতে পরিণত হয়ে বিশ্বে নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম হয়ে উঠবে।

১০৩তম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে নোবেলজয়ী বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী যোগদান করেন। তাঁদের ছবি ও পরিচিতি পাশে দেওয়া হল। কংগ্রেসে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র, উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান ও পুরাতত্ত্ববিজ্ঞান, জৈবরসায়ন, জৈবপদার্থবিজ্ঞান ও আণবিক জীববিজ্ঞান, কম্পিউটারবিজ্ঞান, ভূপদ্ধতিবিজ্ঞান, প্রকৌশলবিজ্ঞান, বস্তুবিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র, চিকিৎসা ও পশুচিকিৎসাবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, পতঙ্গবিজ্ঞান, মৎস্যবিজ্ঞান, জৈবপ্রযুক্তি, ফরেনসিকবিজ্ঞান, আচরণিকবিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়েও গবেষণাপত্র উপস্থাপিত হয়। শুধু তাইই নয়, বিজ্ঞান কংগ্রেসে মহিলা ও শিশুদের আলাচনার জন্য স্বতন্ত্র অধিবেশনের ব্যবস্থাও ছিল। সঙ্গে বিজ্ঞানের অগ্রগতিবিষয়ক প্রদর্শনী তো ছিলই। সম্মেলনে ৫০০০ হাজারের বেশি বক্তা মোট ৬২০ ঘণ্টা আলোচনা করেন। আলোচনা সভার স্থান ছিল ১৫০টির বেশি প্রতিষ্ঠান ও ৫০টি হলঘর।

বক্তাদের মধ্যে কারো কারো বিতর্কিত ও অবৈজ্ঞানিক বক্তব্য দেশ-বিদেশের নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীসহ অনেক বিজ্ঞানীর বিরক্তি উৎপাদন করে। এতে করে ভারতে অতীতে জোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন ও অঙ্কশাস্ত্রে যে বিশাল কর্মযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং পৃথিবী যে ভারতের কাছে ঋণী সে কথাটি চাপা পড়ে যায়। যা-হোক, সামান্য বিতর্ক ছাড়া শেষ পর্যন্ত উদ্যোক্তাদের প্রয়াস সফল হয়েছে এবং ভারতও ১০৩তম কংগ্রেস থেকে এগিয়ে যাওয়ার রসদ সংগ্রহে সক্ষম হবে বলে সকলে প্রত্যাশা করেন।

তপন চক্রবর্তী
বিজ্ঞানলেখক, প্রাবন্ধিক

আটটি উপগ্রহ নিয়ে মহাকাশে
পিএসএলভি সি-৩৫-র
সফল উৎক্ষেপণ

বিজ্ঞান

আটটি উপগ্রহ নিয়ে মহাকাশে নয়া উচ্চতায় ভারত

এক রকেট, দুই রুট। বাঁচল তেল, বাঁচল খরচ। সস্তায় মহাকাশে উপগ্রহ পাঠানোর দৌড়ে আরেক বড় লাফ ভারতের। মোট আটটি উপগ্রহ নিয়ে ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ সোমবার সকালে মহাকাশে পাড়ি দিয়েছিল ভারতের পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিক্‌ল বা পিএসএলভি। আর তাদের মধ্যেই ছিল আবহাওয়া পর্যবেক্ষণকারী এ দেশের উপগ্রহ স্ক্যাটস্যাট। সেই উপগ্রহগুলি দু'টি ভিন্ন কক্ষপথে স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছে ইসরো।

সম্প্রতি ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির ভেগা রকেটও একসঙ্গে একাধিক কক্ষপথে উপগ্রহ স্থাপনের কৃতিত্ব অর্জন করেছে। ফলে ভারত এখন সেই তালিকায়, যারা একই অভিযানে একের বেশি কক্ষপথে উপগ্রহ পাঠাতে পারে।

অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে মহাকাশে পাড়ি ইসরোর পিএসএলভি সি-৩৪ রকেটের

অধিকাংশ দেশই শুধু একটি কক্ষপথেই উপগ্রহ পাঠাতে পারে। একাধিক উপগ্রহ পাঠালেও, সব ক'টি বসে একই কক্ষপথে। কিন্তু যদি আরও একটা কক্ষপথে উপগ্রহ পাঠাতে হয়, তা হলে চাই আরও একটি রকেট। সুতরাং বাড়বে খরচ। দুই কক্ষপথে একবারে উপগ্রহ পাঠিয়ে ভারত সেই বাধাই অতিক্রম করল এবার। সস্তায় মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানোর বাণিজ্যে ভারত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রথম সারিতে। এর জন্য ইসরোর বাণিজ্যিক শাখা 'অ্যানট্রিক্স' রয়েছে। উন্নত দেশগুলির অনেকেই তাই উৎক্ষেপণের দায়িত্ব ভারতকেই দিয়ে থাকে। এবার একই গাড়িতে চাপিয়ে দু'টি ভিন্ন কক্ষপথে যাত্রীদের পৌঁছে দেওয়ার পর ভারতের মহাকাশ বাণিজ্য আরও লক্ষ্মীলাভ করবে বলেই আশা করছেন অ্যানট্রিক্স কর্তারা।

সোমবার সকাল ৯টা ১২ মিনিটে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে উপগ্রহগুলি নিয়ে মহাকাশে রওনা দেয় পিএসএলভি সি-৩৫ রকেট। মোট ৮টি উপগ্রহ। এক সঙ্গে সব্বার ওজন করলে হয় ৬৭৫ কিলোগ্রাম। ভারতের তিনটি। আলজেরিয়ার তিনটি এবং আমেরিকা ও কানাডার ১টি করে।

এই উপগ্রহগুলির মধ্যে ছিল আবহাওয়া পর্যবেক্ষণকারী ভারতের উপগ্রহ 'স্ক্যাটস্যাট'। এর কাজ মূলত সামুদ্রিক আবহাওয়া, সাইক্লোন ইত্যাদির পূর্বাভাস দেওয়া। এ জাতীয় তথ্য সাধারণত আমেরিকার সঙ্গে ভাগ করে নেয় ভারত। আর তার সাহায্যেই ২০১২ সালে হ্যারিকেন স্যান্ডির গতিবিধির ওপর সব সময় নজর রাখতে পেরেছিল আমেরিকা। ভারতের অন্য দু'টি উপগ্রহ (এদের নাম 'প্রথম' ও 'পিস্যাট') বানিয়েছে আইআইটি বম্বে ও বেঙ্গালুরুর পিইএস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

রুদ্ধশ্বাস ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিট পর শেষ হাসি ফোটে ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞানীদের মুখে। ইসরোর চেয়ারম্যান এ এস কিরণকুমার জানান, 'আজ একটা ঐতিহাসিক দিন। ইসরোর দীর্ঘতম মিশন।' মিশন ১০০ শতাংশ সফল বলে জানান ইসরোর বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানীদের সাফল্যে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'আমাদের মহাকাশ বিজ্ঞানীরা ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছেন। ১২৫ কোটি দেশবাসীর হৃদয় জয় করেছেন তাঁরা। দেশকে গর্বিত করেছেন।' ইসরোর গবেষকদের অভিনন্দন জানান রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়।

এ বছরের শেষের দিকে আরও একটা মাইল ফলক পেরোনোর আশা রাখছে ভারত। সবচেয়ে ভারী রকেট জিও-সিঙ্ক্রোনাস স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিক্‌ল মার্ক-থ্রি উৎক্ষেপণ করা হবে। আর এর এতটাই ক্ষমতা যে ৪ টন অর্থাৎ প্রায় ৩৬২৮ কিলোগ্রাম ওজনের উপগ্রহ সে মহাকাশে বয়ে নিয়ে যেতে পারবে বলে আশা করছেন বিজ্ঞানীরা।

২০ উপগ্রহ নিয়ে মহাকাশে গেল ইসরোর রকেট

এর আগে গত ২২ জুন ২০১৬ ইসরোর 'পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল' বা 'পিএসএলভি সি-৩৪'-এর সফল উৎক্ষেপণ সম্পন্ন হয়। সঙ্গে নিয়ে যায় মোট ২০টি কৃত্রিম উপগ্রহ। মহাকাশে পাঠানো হয় ভূ-পর্যবেক্ষণের জন্য একেবারে দেশীয় প্রযুক্তিতে বানানো ভারতীয় মহাকাশযান 'কার্টোস্যাট-২'ও। ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞান-চর্চার ইতিহাসে যা একটি নজির।

ওই দিন অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন মহাকাশ কেন্দ্র থেকে সকাল ৯টার কিছু পরেই উৎক্ষেপণ করা হয় ইসরোর 'পিএসএলভি সি-৩৪' রকেট। ২৬ মিনিটের মধ্যেই তা পৌঁছে যায় মহাকাশে। এর আগে ২০০৮ সালে একইসঙ্গে মোট ১০টি কৃত্রিম উপগ্রহ নিয়ে মহাকাশে পাড়ি জমিয়েছিল ইসরোর রকেট। তবে এ ব্যাপারে 'বিশ্ব রেকর্ড'টি এখনও রয়েছে রাশিয়ার দখলে। ২০১৪ সালে রাশিয়া একই সঙ্গে ৩৭টি উপগ্রহ পাঠিয়েছিল মহাকাশে।

ইসরো সূত্রে জানা যায়, উৎক্ষেপণের সময় 'পিএসএলভি সি-৩৪'-এর মোট ওজন ছিল ৫৬০ কেজি। তবে তার সঙ্গে মহাকাশযান 'কার্টোস্যাট-২'-এর ওজন যোগ করলে মোট ওজন দাঁড়ায় ১,২৮৮ কেজি। ওই ওজন নিয়ে 'পিএসএলভি সি-৩৪' পৌঁছে যায় পৃথিবীর মেরু-ঘেঁষা ৫০৫ কিলোমিটার ওপরের কক্ষপথে, যার নাম 'সান সিনক্রোনাস অরবিট' (এসএসও)। যে ২০টি কৃত্রিম উপগ্রহকে মহাকাশে পৌঁছে দিল ইসরোর 'পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল', তার মধ্যে আমেরিকা, জার্মানি, কানাডা ও ইন্দোনেশিয়ারও ৪টি উপগ্রহ ছিল।

সূত্র পিটিআই

বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য ভারত সরকারের স্কলারশিপসমূহ

প্রতি বছর ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন ভারত ও বাংলাদেশে পড়ালেখার জন্য বিভিন্ন স্কিমে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য বিপুলসংখ্যক স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে। এগুলি নিম্নরূপ:

১. আইসিসিআর স্কলারশিপসমূহ

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেসন্স (আইসিসিআর) ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কোর্স গ্রহণে নিম্নোক্ত স্কলারশিপসমূহ প্রদান করে:

ক. ইন্ডিয়া স্কলারশিপ স্কিম;
খ. বাংলাদেশ স্কলারশিপ স্কিম;
গ. সার্ক স্কলারশিপ স্কিম;
ঘ. কমনওয়েলথ স্কলারশিপ স্কিম; এবং
ঙ. আয়ুষ স্কলারশিপ স্কিম।

ইন্ডিয়া স্কলারশিপ স্কিম

যুব বিশেষত বাংলাদেশের তরুণ শিক্ষার্থী বিনিময় বৃদ্ধির ভারতীয় প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকা সফরকালে মর্যাদাপূর্ণ ইন্ডিয়া স্কলারশিপ স্কিম ঘোষণা করেন। সেই সূত্রে আইসিসিআর ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে স্কিমটি প্রবর্তন করে। এ বৃত্তির আওতায় শিক্ষার্থীরা মানবিক, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর/পিএইচ ডি কোর্স (ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিসিন ছাড়া)-এ ভারতে অধ্যয়ন করতে পারেন।

বাংলাদেশ স্কলারশিপ স্কিম

এ স্কিমের আওতায় আইসিসিআর প্রতি বছর প্রকৌশল, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, ব্যবস্থাপনা, ফার্মাসি, চারুকলা ও চিরায়ত ভারতীয় ভাষাসমূহ অধ্যয়নে স্নাতক/স্নাতকোত্তর/এম ফিল/পিএইচ ডি/পোস্ট ডক্টরাল কোর্সে (মেডিসিন ছাড়া) শিক্ষার্থীদের স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে।

সার্ক স্কলারশিপ স্কিম

এ স্কিমের আওতায় আইসিসিআর স্নাতক/ স্নাতকোত্তর/ এম ফিল/ পিএইচডি (মেডিসিন ছাড়া) কোর্সে স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে।

কমনওয়েলথ স্কলারশিপ স্কিম

এ স্কিমের আওতায় আইসিসিআর স্নাতক/স্নাতকোত্তর/এম ফিল/পিএইচ ডি/পোস্ট ডক্টরাল কোর্সে (মেডিসিন ছাড়া) স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে।

উপরোক্ত ক-ঘ স্কিমগুলির জন্য সাধারণত ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দানের মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা আরো তথ্যের জন্য ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন: www.hcidhaka.gov.in

আয়ুষ স্কলারশিপ স্কিম

প্রতি বছর ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন ভারতের ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা ব্যবস্থা যেমন আয়ুর্বেদ, ইউনানি, সিদ্ধ ও হোমিওপ্যাথি কোর্সে অধ্যয়নের জন্য আইসিসিআর-এর এ কোর্সের জন্য স্কলারশিপ নির্বাচন সমন্বয় করে থাকে। স্কিমটি সাধারণত জুলাই মাসে ঘোষণা করা হয়।

২. বিদেশ মন্ত্রকের স্ব-অর্থায়ন স্কিম

ভারত সরকারের বিদেশ মন্ত্রকের স্ব-অর্থায়ন স্কিমে প্রতি বছর বি ই, বি ফার্মাসি এবং এমবিবিএস/ বিডিএস শিক্ষার্থীদের জন্য স্বল্প সংখ্যক আসন বরাদ্দ করে থাকে, যার জন্য প্রতি বছর সাধারণত মার্চ-এপ্রিল মাসে দরখাস্ত আহ্বান করা হয় এবং ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনে এ-সবের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এ সম্পর্কে আরও জানতে ভারতীয় হাই কমিশনের এডুকেশন এ্যাটাশের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

৩. মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরসূরীদের জন্য ভারত সরকারের স্কলারশিপ

ভারত সরকার ২০০৬-০৭ সাল থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যক্ষ উত্তরসূরীদের জন্য প্রতি বছর স্নাতক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য স্কলারশিপ দিয়ে আসছেন। স্নাতক পর্যায়ে নির্বাচিত শিক্ষার্থীকে প্রতি বছর ২৪,০০০/= টাকার স্কলারশিপ চার বছর ধরে তার স্নাতক শেষ না হওয়া পর্যন্ত দেওয়া হয়। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে নির্বাচিত শিক্ষার্থীকে প্রতি বছর ১০,০০০/= টাকার স্কলারশিপ দুই বছর ধরে দেওয়া হয়।

ভারত সরকার প্রতি বছর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যক্ষ উত্তরসূরীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করে থাকে। ওয়েবসাইটে দরখাস্তের নমুনা দেওয়া আছে।

• বিজ্ঞপ্তি

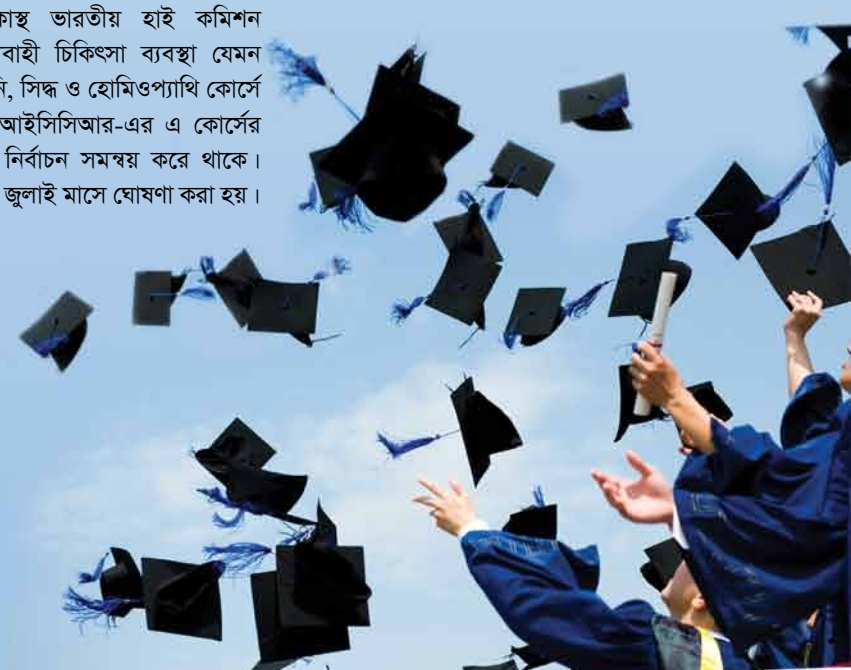

উৎসব

বাঙালির সার্বজনীন উৎসব

সংঘমিত্রা সাহা

পৃথিবীতে হিন্দু ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর মধ্যে দুর্গাপূজা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। ভারতীয় উপমহাদেশে এটি হিন্দু ধর্মের প্রধান অনুষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত। ভারতে সপ্তাহব্যাপী আনন্দোৎসবে নানান অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে সকল বয়সের মানুষ একাত্মতায় মিলিত হয়। পূজামণ্ডপ ঘিরে শুরু হয় নানান কর্মযজ্ঞ। নানা বর্ণে নানা আয়োজনে উৎসবে ভরে থাকে সমস্ত এলাকা। কাঁসর ঘণ্টা আর ঢাকের তালে আন্দোলিত হয়ে ওঠে পূজার সকল আয়োজন।

দুর্গাপূজা কবে কখন কোথায় প্রথম শুরু হয়েছিল তার সঠিক তথ্য জানা যায় না। মাতৃতান্ত্রিক দ্রাবিড় জাতির মধ্যে ভারতে মাতৃদেবীর পূজার প্রচলন ছিল। দেবতাদের প্রাধান্য ছিল আর্য সভ্যতায়। অনার্য সভ্যতায় প্রাধান্য ছিল দেবীদের। দেবীগণ পূজিত হতেন শক্তির প্রতীক রূপে।

দুর্গাপূজা

ভারতীয় উপমহাদেশে মাতৃরূপে দেবীর বন্দনা অতি প্রাচীন। ইতিহাসবিদদের মতে, প্রায় ২২,০০০ বছর পূর্বে ভারতে দেবী পূজা প্রচলিত ছিল। মাতৃপ্রধান পরিবারের মা-ই প্রধান শক্তি, আর মাকে সামনে রেখে দেবী বিশ্বাস গড়ে উঠেছে। মহাভারত অনুসারে, দুর্গা বিবেচিত হন কালী শক্তির আরেক রূপে। দুর্গা শিবের অর্ধাঙ্গিনী তাই দেবী

দুর্গাপূজার ইতিহাস ও সামাজিক দিক

ড. কানাইলাল রায়

বেদের দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্তে দুর্গা সম্পর্কে আলোচনার প্রাথমিক সূত্রপাত দেখতে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে কালিকাদিপুরাণ গ্রন্থে দুর্গা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডের ১ম অধ্যায়ের ১ম শ্লোকেই পঞ্চ প্রকৃতির কথা বলা হয়েছে– এঁরা হলেন– গণেশজননী দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী।

গণেশজননী দুর্গা রাধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী।
সাবিত্রী চ সৃষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চধা স্মৃতা ॥

দেবী মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার রূপভেদ নিয়ে নানা বাদানুবাদ আছে। দেবী দুর্গার প্রাচীন যেসব মূর্তি বা ভাস্কর্য পাওয়া গেছে, সেখানে দুর্গাকে মহিষমর্দিনীরূপে স্বজন-পরিজনহীন একাকীই দেখতে পাওয়া যায়। কালিকাপুরাণ বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণ,

মাতা হিসেবেও তাঁর পূজা হয়ে থাকে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে ব্রহ্মার পরামর্শে রামের দুর্গাপূজা করার কথা উল্লেখিত আছে। শক্তিশালী রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিজয়ে শরৎকালে শ্রী রামচন্দ্র কালিদহ সাগর থেকে ১০৮টি নীল পদ্ম সংগ্রহ করে দুর্গাপূজার মাধ্যমে দুর্গার কৃপা লাভ করেন বলে বর্ণিত হয়েছে। সনাতন ধর্মের আর্য ঋষিরা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতীক হিসেবে দেবী দুর্গার আশীর্বাদ লাভের জন্য আরাধনা করতেন। আজো বাংলায় শ্রী শ্রী চণ্ডী নামে সাতশো শ্লোক বিশিষ্ট দেবী মাহাত্ম্য পাঠ দুর্গাপূজার প্রধান ও অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে আছে।

দুর্গাপূজার প্রচলন নিয়ে বেশ কয়েকটি মতবাদ পাওয়া যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণ মতে, চেদী রাজবংশের রাজা সুরথ খ্রিস্টের জন্মের ৩০০ বছর আগে কলিঙ্গে (বর্তমানে উড়িষ্যা) দুর্গাপূজার প্রচলন করেছিলেন। ভিন্ন মতে, ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে দিনাজপুরের জমিদার প্রথম দুর্গাপূজা করেন। আবার কারো মতে, ষোড়শ শতকে রাজশাহীর তাহেরপুর এলাকার রাজা কংসনারায়ণ প্রথম দুর্গাপূজা করেন। অনেকে মনে করেন, ১৬০৬ সালে নদীয়ার ভবানন্দ মজুমদার দুর্গা পূজার প্রবর্তক। উড়িষ্যার রামেশ্বরপুরে একই স্থানে ৪০০ শত বছর থেকে দুর্গা পূজা হয়ে আসছে। জমিদার বাড়ি থেকেই এই পূজার প্রচলন হয়েছিল। ১৭১১ সালে অহম রাজ্যের রাজধানী রংপুরে শারদীয় পূজার নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের দূত রামেশ্বর ন্যায়লঙ্কার।

বর্তমানে দুর্গাপূজা দুইভাবে হয়ে থাকে, ব্যক্তিভাবে পারিবারিক স্তরে ও সমষ্ঠিগতভাবে পাড়া স্তরে। ব্যক্তিগত পূজাগুলি নিয়মনিষ্ঠা ও শাস্ত্রীয় বিধান পালনে বেশি আগ্রহী হয়; এগুলির আয়োজন মূলত বিত্তশালী বাঙালি পরিবারগুলিতেই হয়ে থাকে। অন্যদিকে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের বাসিন্দারা একত্রিত হয়ে যৌথ উদ্যোগেও দুর্গোৎসবের আয়োজন করেন। এগুলি বারোয়ারি বা সার্বজনীন পূজা নামে পরিচিত। ১৭৯০ সালে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার গুপ্তি পাড়াতে বারোজন বন্ধু মিলে চাঁদা তুলে প্রথম সার্বজনীনভাবে দুর্গোৎসব পালন করেন, যা বারোইয়ার বা বারোবন্ধুর পূজা নামে ব্যাপক পরিচিতি পায়। কাশিমবাজারের রাজা হরিনাথ ১৮৩২ সালে বারোইয়ারের এই পূজা কলকাতায় পরিচিত করান। সম্ভবত সেই থেকে বারোয়ারি পূজা শুরু। ১৯১০ সালে সনাতন ধর্ম উৎসাহিনী সভা ভবানীপুরে বলরাম বসু ঘাট লেনে এবং একই জেলায় অন্যান্যরা রামধন মিত্র লেন, সিকদার বাগানে একই বছরে ঘটা করে প্রথম বারোয়ারি পূজার আয়োজন করে। ব্রিটিশ বাংলায় এই পূজা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দুর্গাপূজা বারোয়ারি বা কমিউনিটি পূজা হিসাবে জনপ্রিয়তা পায়। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর দুর্গা পূজা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে অন্যতম প্রধান উৎসবের মর্যাদা লাভ করে।

সাধারণত আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠ দিন অর্থাৎ ষষ্ঠী থেকে দশম দিন অর্থাৎ দশমী পর্যন্ত পাঁচ দিন দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই পাঁচ দিন দুর্গাষষ্ঠী, মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী, মহানবমী ও বিজয়া দশমী নামে পরিচিত। আর সমগ্র পক্ষটি দেবীপক্ষ নামে খ্যাত। পূর্ববর্তী অমাবস্যার দিন দেবীপক্ষের সূচনা হয়; দিনটি মহালয়া নামে পরিচিত। অন্যদিকে দেবীপক্ষের সমাপ্তি হয় পঞ্চদশ দিনে অর্থাৎ পূর্ণিমায়। এই পঞ্চদশ দিনটিতে বাৎসরিক লক্ষ্মীপূজা অনুষ্ঠিত হয। সার্বজনীন এই দুর্গাপূজা মূলত পাঁচদিনের অনুষ্ঠান হলেও বাস্তবে মহালয়া থেকে উৎসবের সূচনা এবং লক্ষ্মীপূজায় তার সমাপ্তি।

কুমারী পূজা দুর্গাপূজার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শাস্ত্রমতে ১ বছর থেকে ১৬ বছরের অজাতপুষ্প অবিবাহিত সুলক্ষণা ব্রাহ্মণ কুমারী কন্যাকে পূজা করা হয়। নির্বাচিত কুমারীকে স্নান করিয়ে নতুন কাপড়ে দেবীর মত সাজিয়ে সুসজ্জিত আসনে বসিয়ে ষোড়শোপচারে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই কুমারী পূজার মধ্য দিয়ে নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়। ১৯০১ সালে ভারতীয় দার্শনিক ও ধর্মপ্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ সর্বপ্রথম কলকাতার বেলুড় মঠে এই কুমারী পূজার প্রচলন করেন। হিন্দু সমাজে বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, চিরবিধবাসহ নানা অবিচারে তখন নারীরা ছিল নিপীড়িত। নারীকে দেবীর আসনে সম্মানিত করার জন্যেই স্বামী বিবেকানন্দ এ পূজার প্রচলন করেন। প্রতিবছর দুর্গাপূজার অষ্টমী তিথিতে এ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। আধ্যাত্মিক ও জাগতিক কল্যাণসাধন কুমারী পূজার মূল লক্ষ্য।

সন্ধিপূজা, দুর্গাপূজার আরেকটি বিশেষ অংশ। অষ্টমী তিথির শেষ ২৪ মিনিট ও নবমী তিথির প্রথম ২৪ মিনিট মোট ৪৮মিনিট সময়ে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। অষ্টমী ও নবমী তিথির সন্ধিক্ষণে এই পূজা হয় বলেই এই পূজার নাম সন্ধিপূজা। এ সময় দেবী দুর্গাকে চামুণ্ডা রূপে পূজা করা হয় এবং তান্ত্রিকমতে এই পূজায় দেবীকে ষোলটি উপাচার নিবেদন করা হয়।

জাতীয়ভাবে এই উৎসবকে দুর্গাপূজা হিসেবে অভিহিত করা হলেও দক্ষিণ এশিয়ায় এই উৎসবকে শরৎকালের বার্ষিক মহোৎসব হিসেবে শারদীয় উৎসব বলা হয়ে থাকে। রামায়ণ অনুসারে, অকালে বা অসময়ে দেবীর আগমন হয় বলে শরৎকালের দুর্গাপূজাকে অকালবোধন এবং বসন্তকালের দুর্গাপূজাকে বাসন্তী পূজা বলা হয়।

অতীতে বাঙালি হিন্দুদের বাইরে এ পূজার খুব জনপ্রিয়তা ছিল না। ধীরে ধীরে এই পূজার জনপ্রিয়তা এবং গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দুর্গাপূজা ভারতের আসাম, বিহার, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপকভাবে উদযাপন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় সবচেয়ে বড় সামাজিক, সাংস্কৃতিক উৎসব হিসাবে পালিত হয় দুর্গাপূজা।

সংঘমিত্রা সাহা
সাংবাদিক, গবেষক ও কলামিস্ট

মার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থের ধ্যানমন্ত্রে দেবী দুর্গার স্বরূপ বা মূর্তি নির্মাণেও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, বিশেষ করে দেবীর হাতের বিন্যাসে ও হাতের সংখ্যায়।

তাছাড়া, দেবীর অঙ্গ ও রূপ বর্ণনায়ও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। একদিকে দেবী রণ-রঙ্গিণী ও ভয়ঙ্করী, অন্যদিকে তিনি প্রসন্নবদনা, বরাভয়দায়িনী প্রপন্নার্তিহরা। দেবী দুর্গাকে প্রাচীন ভারতে, সাধারণত দ্বিভুজা ও চতুর্ভুজারূপে চিন্তা করা হত (প্রাচীন মহিষাসুরমূর্তিগুলি তার প্রমাণ)। পরে চিন্তার বিচিত্রতায় দেবী দুর্গা ষড়্ভুজা, অষ্টভুজা, দশভুজা, দ্বাদশভুজা, অষ্টাদশভুজা বা এমনকি সহস্রভুজারূপেও পরিদৃষ্ট হয়েছেন। হাতের সংখ্যার সঙ্গে হাতে-ধরা বিভিন্ন অস্ত্রাদি (শূল, চক্র, খড়্গ প্রভৃতি) ও বস্তুর বৈচিত্র্যও লক্ষ্য করা যায়। তবে উভয় বঙ্গে (বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে) দেবী দুর্গার দশভুজারূপটি বেশি প্রতিষ্ঠিত। দেবী দুর্গার চালচিত্রে বা কাঠামোতে একইসঙ্গে যাঁরা অবস্থান করছেন অর্থাৎ লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশ ও শিব– এই পরিকল্পনাটি খুব প্রাচীন নয়। প্রাচীন পুরাণ-তন্ত্রাদি গ্রন্থের ধ্যানমন্ত্রে এঁদের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

দেবীকবচ স্তোত্রে দেবী দুর্গার শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিণী প্রভৃতি নয়টি নামের উল্লেখ আছে। দুর্গা ছাড়াও দুর্গার দশবিধ মূর্তি বা দশ মহাবিদ্যার পরিচয়ও পাওয়া যায়। শক্তিদেবতার বহুবিধ মূর্তির মধ্যে কালি, তারা প্রমুখ দশমহাবিদ্যা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। নবদুর্গা ও দশমহাবিদ্যা ছাড়াও দেবী দুর্গার বহুবিধ নাম ও রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, ভীমা, জগদ্ধাত্রী, গন্ধেশ্বরী, অন্নপূর্ণা, অম্বিকা, উমা-হৈমবতী প্রমুখ।

সমস্ত পৌরাণিক ও তান্ত্রিক দেবী-ধারণার মূল উৎস বৈদিক দেবী অদিতি, ঊষা ও সরস্বতী। তাছাড়া, অথর্ববেদ, শতপথব্রাহ্মণ, নারায়ণ উপনিষদ প্রভৃতি থেকেও উদ্ধৃতি দিয়ে বেদে দুর্গার অবস্থানকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

অগ্নি, মৎস্য, নারদীয়, বরাহ, ভবিষ্য, বিষ্ণু, কালিকা, বৃহন্নন্দিকেশ্বর, ব্রহ্মবৈবর্ত, দেবীভাগবত, বামন প্রভৃতি পুরাণ-উপপুরাণে দেবী দুর্গার বৈচিত্র্যপূর্ণ নানারূপ ও পরিচয় পাওয়া যায়। দেখা যাচ্ছে, দেবী দুর্গার চরিত্র ও রূপের পরিণতি ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে অন্যান্য বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ক্রমবিকাশের পথে পৌরাণিক যুগে এসে পূর্ণতা লাভ করেছে। মহিষমর্দিনী দেবী দুর্গার যেমন বিচিত্র নাম, তেমনি তার বিচিত্র রূপ। মহিষাসুরও বৈদিক বৃত্রাসুরের মত কোন নৈসর্গিক আলোক আবরণকারী অশুভশক্তির প্রতীক। দেবী দুর্গার মত মহিষাসুরেরও অনেক প্রতীকী ব্যাখ্যাও আছে।

তন্ত্র হচ্ছে শিব ও শক্তির উপাসনাবিষয়ক শাস্ত্র। তন্ত্র বিষয় ভেদে প্রধানত তিন শ্রেণিতে বিভক্ত– আগম, যামল ও তন্ত্র। তন্ত্র আবার হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্র ভেদে দ্বিবিধ। তন্ত্রের প্রাথমিক বিকাশ বঙ্গদেশে। বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম হীনবীর্য হয়ে পড়লে তান্ত্রিক ধর্ম প্রচারিত হয় এবং কালক্রমে সারা ভারতবর্ষে বিস্তৃতিলাভ করে। বৌদ্ধ মহাযানী সম্প্রদায় মূলত তান্ত্রিক ধর্মের অনুসারী। তান্ত্রিকদের ইষ্ট দেবী হলেন কালী, তারা, ভৈরবী বা দুর্গা। বঙ্গের বিভিন্ন পূজা-পার্বণ বর্তমানে মূলত তন্ত্রশাস্ত্র অনুযায়ী সম্পন্ন হয়। তন্ত্রের সংখ্যা অসংখ্য। তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল– সারদাতিলক, যোগিনীতন্ত্র, বরাহীতন্ত্র, বিশ্বসারতন্ত্র, রুদ্রযামল, তন্ত্রসার কুলার্ণবতন্ত্র, কামাখ্যাতন্ত্র, কাত্যায়নীতন্ত্র প্রভৃতি। ঋগ্বেদের বাক্‌দেবী, রাত্রি ও শ্রীসূক্তই পরে পৌরাণিক যুগে মার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত দুর্গাসপ্তশতী বা চণ্ডীতে দেবী মাহাত্ম্যের অঙ্গীভূত করা হয়েছিল। ঋগ্বেদের বাক্‌দেবী বা সরস্বতী, রাত্রি ও শ্রীদেবী– এই তিন দেবীর ধারণা নিয়ে পরে চণ্ডীতে মহাকালী, মহালক্ষ্মী এই তান্ত্রিকী দেবী রূপায়িত হয়েছিল।

বৈদিক যুগ ও মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার যুগ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত এই পূজার মোটামুটি ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। 'পূজা' কথাটি দ্রাবিড় জাতির, এর অর্থ পুষ্পকর্ম। আর্য জাতি অনার্য দ্রাবিড়জাতির সংস্পর্শে আসার ফলে দ্রাবিড় পূজা শব্দটি আর্য ভাষা সংস্কৃতে স্থান পায়। তখন পূজা তথা পুষ্পকর্মের অর্থ দাঁড়ায়– ফুল বেলপাতা নৈবেদ্য প্রভৃতি উপকরণ দ্বারা ভগবানের আরাধনা। বৈদিকশাস্ত্র বলে যজ্ঞের কথা, তন্ত্রশাস্ত্র বলেছে পূজার কথা। ভারতীয় সংস্কৃতিতে বৈদিক ও পৌরাণিক তান্ত্রিক সভ্যতা যখন অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলিত হয়ে গেছে, তখন সকল বিশিষ্ট ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে যজ্ঞ ও পূজা পাশাপাশি বিদ্যমান রয়েছে। দুইয়ের মূল উদ্দেশ্য একই– গৌণত কাম্যবস্তু লাভ, মুখ্যত মোক্ষ বা ব্রহ্মপদলাভ।

বৈদিক যুগের শারদোৎসব বা রুদ্রযজ্ঞ, সিন্ধু উপত্যকায় আবিষ্কৃত প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু পোড়া মাটির স্ত্রী মূর্তি প্রভৃতি দুর্গাপূজার প্রাচীনত্বের পরিচায়ক। ছান্দোগ্য উপনিষদ, তৈত্তিরীয় আরণ্যক, মুণ্ডকোপনিষদ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, কালিকাপুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণ, দেবীভাগবত, কালিবিলাসতন্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন পুরাণতন্ত্রাদি গ্রন্থে কোথাও কোথাও কিছুটা রূপকাশ্রিত হলেও প্রায় ধারাবাহিকভাবে দুর্গাপূজার কথা জানা যায়।

বাঙালি হিন্দুর সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বৃহৎ জাতীয় উৎসব দুর্গাপূজা। আদিতে চৈত্রমাসে তথা বসন্তকালে দুর্গাপূজা হতো, যা 'বাসন্তীপূজা' নামে খ্যাত। তবে শরৎকালে অনুষ্ঠিত শারদীয়া দুর্গাপূজাই অধিক জনপ্রিয়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুযায়ী প্রকৃতপক্ষে রাজা সুরথই প্রথম বাংলাদেশে দুর্গাপূজা করেছিলেন। গবেষকদের মতে, সুরথের রাজধানী বলিপুর হল বর্তমান বোলপুর। তবে বাংলায় সর্বপ্রথম সাড়ম্বরে দুর্গাপূজার প্রচলন করেন সম্রাট আকবরের বারভূঁইয়ার অন্যতম রাজশাহী জেলার তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ। কথিত আছে, রাজা কংসনারায়ণ এই শারদীয় দুর্গোৎসবে তখনকার দিনে সাড়ে আটলক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন। তাঁর দেখাদেখি ভাদুড়িয়ার জমিদার জগৎনারায়ণ ঐ বৎসরই বসন্তকালে বাসন্তী দুর্গোৎসব করেছিলেন নয়লক্ষ টাকা ব্যয়ে। কিন্তু তাঁর পূজা কংসনারায়ণের অনুরূপ জনপ্রিয়তা পায়নি। মারাঠী বর্গীপ্রধান ভাস্কর পণ্ডিত ১৭৪২ সালে কাটোয়ায় দুর্গাপূজা করেছিলেন। তবে নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় থেকে এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় সারা বঙ্গে বিশেষত কলকাতায় সাড়ম্বরে মৃণ্ময়ী প্রতিমায় দুর্গাপূজার প্রচলন হয়। কলকাতার নবকৃষ্ণদেব ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দর্পনারায়ণ ঠাকুর জাঁকজমকসহকারে দুর্গাপূজা করতেন। স্মার্ত রঘুনন্দন রচিত 'দুর্গোৎসবতত্ত্ব' ও 'দুর্গাপূজাতত্ত্ব' গ্রন্থদুটি থেকে অনুমান করা যায় তাঁর সময়ে (এখন থেকে ৪০০ বৎসর পূর্বে) শরৎকালে দশভুজা মৃণ্ময়ী দুর্গাপূজার প্রচলন ছিল।

প্রায় সমসাময়িক বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবতে' আছে–

মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে সর্বঘরে।
দুর্গোৎসবকালে বাদ্য বাজাবার তরে ॥ মধ্য, ২৩ অধ্যায়

এ থেকে বোঝা যায়, ষোড়শ শতাব্দীর আগেই দুর্গাপূজা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

দুর্গাপূজার সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। জীবনে অশুভ অসুর শক্তির বিনাশ করে শুভ সুর শক্তির প্রতিষ্ঠা দুর্গাপূজার শাশ্বত দর্শন। দুর্গাপূজা জাতীয় মহা আলোড়ন সৃষ্টিকারী ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এতে জড়িত হয় সর্বস্তরের মানুষ। ব্রাহ্মণ, মালি, কুম্ভকার, তন্তুবায়, নরসুন্দর, ঋষিদাস প্রভৃতি সর্ববর্ণের সর্বস্তরের মানুষের সহায়তা ও মিলন প্রয়োজন হয় দুর্গাপূজায়। বহু বিস্তৃত উদার ব্যাপক অনুভূতি জাগে এই পূজায়। বাস্তবিকই ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচু, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, এমনকি, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষের মহামিলনের ক্ষেত্র এই দুর্গাপূজা। এর ফলে সামাজিক বন্ধন যেমন দৃঢ় হয়, মানুষ অর্থনৈতিক দিক দিয়েও নানাভাবে উপকৃত হয় এই দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে।

দশভুজা দুর্গার কাঠামোতে দেশ ও জাতির সংহতি সাধনের স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। দুর্গা প্রতিমায় লক্ষ্মী ধনের, সরস্বতী জ্ঞানের, কার্তিক বীরত্বের, গণেশ সাফল্যের প্রতীক, আর দুর্গার দশটি হাত আর দশটি প্রহরণ (অস্ত্র) অপরিমেয় বলবীর্যের প্রতিক। সিংহ বশ্যতার প্রতীক আর মহিষাসুর সমস্ত অশুভের প্রতীক। একটি বলিষ্ঠ জাতি সমস্ত অশুভকে দলিত করে পরিপূর্ণতা লাভ করে। দেবী দুর্গার আরাধনাকে কেন্দ্র করে আমাদের মনেও এই ধারণাই দৃঢ়ীভূত হয়।

দুর্গাপূজা কেবল ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয় সামাজিক মিলন উৎসবও বটে। এই পূজার সময় সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জনকল্যাণের জন্যই দুর্গাপূজা। জাতির ঐহিক ও পারত্রিক তথা সামগ্রিক কল্যাণই দুর্গাপূজার মূল লক্ষ্য। প্রপন্নার্তিহরা মা দুর্গা সকলের প্রতি প্রসন্ন হোন।

ড. কানাইলাল রায়
শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

ছোটগল্প

নীল পিঁপড়ে

শমীক ঘোষ

গানটা লালনের। তবে এখন ব্যান্ডের হয়ে গিয়েছে। সেটাই বাজছে এখন। পিছনে ড্রাম আর রক গিটার। গলাটাও একটু ভাঙা। আরো ভাঙা লাগছে মাইকের দোষে। 'সহজ মানুষ ভজে দেখ না রে মন দিব্যজ্ঞানে।'

বারান্দা থেকে প্যান্ডেলটা দেখা যায় না। শুধু রাস্তার ওধারের বাড়িগুলোর ওপর দিয়ে সামান্য দেখা যায় চূড়ার পিছনদিকটা। রঙ নেই। বাহারি কাপড় নেই। শুধু ত্রিপল, কঞ্চি আর বাঁশের কাঠামো। নিচের রাস্তাটা প্রায় ফাঁকা। শুধু সার দিয়ে বেশ কয়েকটা গাড়ি। রাস্তার ওপর একফালি আকাশ। ছোটবেলার ড্রয়িং খাতা যেন। প্যাস্টেলে তড়িঘড়ি রঙ করতে করতে এখানে ওখানে বেরিয়ে আছে খাতার সাদা। ঘন নীলের মধ্যে অমনই ঝিরঝিরে সাদা মেঘ। টুথপেস্টের ফেনার মত ছড়ানো। বড় বেমানান নিচের বাড়িগুলো, রাস্তাটা।

'নীলপিঁপড়ে! যত বাজে কথা।'

'সত্যি রে। লুকিয়ে থাকে। দেখা যায় না এমনিতে। কিন্তু...'

'কী?'

অমিতেশ উঠে দাঁড়ান কষ্ট করে। পা দু'টো টেনে টেনে হেঁটে যান ভিতরের ঘরের দিকে। সোফাসেট, ডাইনিং টেবিল। একদিকে বন্ধ হয়ে যাওয়া ঢাউস কালার টিভি। জানলার পর্দাগুলো একপাশে টানা। পুরনো পেলমেট। সবকিছুর উপরেই ধুলোর আস্তরণ। আগে সুদক্ষিণা ফিটফাট পরিষ্কার রাখতেন সব। হাসপাতাল থেকে ফেরার পর আর ধকল নিতে পারেন না।

'ধরে হাতের মুঠির মধ্যে পুরে যা চাইবি তাই পাবি।'

কুসুমপুরের আকাশটা আরো বড় ছিল। আর পৃথিবীটাও। এদিকে ওদিকে কাশের বন। উঁচু নিচু জমি, নদী। আর দূরে রেললাইন।

'দিব্যজ্ঞান! এত দিব্যজ্ঞান শুনেও মাইকের আওয়াজ কমানোর আক্কেল হয়নি।' সুদক্ষিণা ঝাঁটা হাতে এসে দাঁড়িয়েছেন কখন। 'ঝাঁটা নিয়েছ! আবার টান উঠলে।' অমিতেশ উঠে বসার চেষ্টা করেন। সময় লাগে। দু'পায়ে আর্থারাইটিস। হাতগুলো কাঁপে।

'এত দিন যেন নিইনি। ষষ্ঠীর দিন ঝাঁট না দিলে হয়!'

'ষষ্ঠী! আজ উপোসও করবে নাকি!'

'...করলে হত। ছেলেটার জন্য...' সুদক্ষিণা হঠাৎ থমকে যান।

'আজকে উপোস করবে! তাহলে...'

অমিতেশ থেমে যান নিজেই। তাকিয়ে থাকেন কয়েক লহমা। সুদক্ষিণার ফর্সা মুখটা কেমন কালচে হয়ে গিয়েছে। চুল উঠে কপালটা অনেক চওড়া। কালি দু'চোখের নিচে। পুরো শরীরটাই শুকিয়ে গিয়েছে কেমো নিতে নিতে।

'তুমি বাজার যাবে তো?'

'অ্যাঁ।'

'বাজার! বাজারে যাবে না? কাল যে বললে?'

'আজ আর ঝাঁট-টাঁট দিও না। টাকা দাও বাজারে যাই।'

অমিতেশ উঠে দাঁড়ান কষ্ট করে। পা দুটো টেনে টেনে হেঁটে যান ভিতরের ঘরের দিকে। সোফাসেট, ডাইনিং টেবিল। একদিকে বন্ধ হয়ে যাওয়া ঢাউস কালার টিভি। জানলার পর্দাগুলো একপাশে টানা। পুরনো পেলমেট। সবকিছুর উপরেই ধুলোর আস্তরণ। আগে সুদক্ষিণা ফিটফাট পরিষ্কার রাখতেন সব। হাসপাতাল থেকে ফেরার পর আর ধকল নিতে পারেন না। একটু বেশি চাপ নিলেই শ্বাসকষ্ট। কাজের লোকও ছেড়ে দিতে হয়েছে বেশ কয়েকমাস।

'এইগুলো বিক্রি করে দিলেই হত।'

'আগেও তো বলেছ। কটা টাকাই বা পেতে।'

'তাও।'

'দাঁড়াও। থলেটা ধুয়ে দিই। এত ধুলো।'

'ধুতে হবে না, টাকাগুলো দাও।'

'দিচ্ছি। শোন, ভাল জামা বার করে রেখেছি। ওটা পরে নিও।'

অমিতেশ মুখ ফেরান। ম্লান হাসেন। 'তুমিও পারলে পরো। ভাল কিছু।'

টাকাগুলো রাখা শোবার ঘরের আলমারির মধ্যে। প্লাস্টিকের প্যাকেটে মোড়া। গতকাল ব্যাংক থেকে নিয়ে এসেছিলেন অমিতেশ। একটা হাজার টাকার নোট। দুটো পাঁচশো। বাকি একশো টাকা আর খুচরোয়। মোট তেইশশো টাকা। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ক্লোজ করার সময় ইন্টারেস্টে পাওয়া গিয়েছিল আরো একটাকা তেতাল্লিশ পয়সা। পে অর্ডার করেই দিতে চেয়েছিল। অমিতেশ নেননি। টাকাগুলো আবার গুনে নেন সুদক্ষিণা।

চিরকাল এমনভাবেই গুনে গিয়েছেন। প্রথম যখন বিয়ে করে এসেছিলেন তখন অমিতেশ সামান্য টাকা মাইনে পান। অসুস্থ শাশুড়ি। অবিবাহিত দু'দুটো ননদ। সংসার টানতে গলদঘর্ম হতেন দু'জনেই। অমিতেশ মাইনে পেলে নিয়ে আসতেন এইভাবেই। মাসের মাঝখান থেকে বারবার গুনেও কিভাবে পুরো মাসটা টানবেন বুঝতে পারতেন না সুদক্ষিণা। তারপর বুবান হল। খরচ বাড়ল। শেষ দিকে পুরো খরচটাই ওকে নিয়ে। গোটা জীবন কেটে গেল শুধু টাকা-টাকা করে।

'আর গুনে কী হবে!'

জামা বদলে অমিতেশ চলে এসেছেন। হাতের থলেটা ভিজে। মোটা ফোঁটায় জল গড়াচ্ছে মাটির উপর। 'কী কাণ্ড! নিজে ধুতে গেলে। পুরো ঘর জলে একাক্কার। আর আমাকে বলছিলে ঝাঁট দিতে হবে না। কাজতো নিজেই বাড়িয়ে দিলে।'

'কী করব এত ধুলো।' অমিতেশ অপ্রস্তুত হয়ে যান।

'আমিতো বলেছিলাম ধুয়ে দিচ্ছি।'

'জিজ্ঞাসা করেছিলে না তোমার চিকিৎসা করালাম কেন। তুমি না থাকলে আমি একা পারতাম?'

'সেই করাতে গিয়েই তো এই অবস্থা।' হাতের কাছে একটা কাপড়ের টুকরো নিয়ে সুদক্ষিণা থলেটা মুছতে থাকেন নিচু হয়ে।

'কী করব নিজের ছেলে সেও যদি... আমাদেরই দোষ ছিল বোধহয়... অমানুষ!'

'ষষ্ঠীর দিন! ছেলেকে অমন...ছাড় না। আমাদের ভাগ্য!'

চারতলার ফ্ল্যাট। লিফট নেই। যে সময় ফ্ল্যাটটা কিনেছিলেন সেই সময় লিফট এত সহজলভ্য হয়নি। তাছাড়া পরের বছর বুবানের হায়ার সেকেন্ডারি। খরচও ছিল। পড়াশুনোয় ভালও ছিল বাবান। সুদক্ষিণার ইচ্ছা ছিল বিদেশ যাবে। অমিতেশ ফ্ল্যাটের পিছনে বেশি খরচাও করতে চাননি। স্কলারশিপ পেলেও খরচ তো আছে। সিঁড়ি দিয়ে নামার আগে অমিতেশ পিছনে ফিরেছিলেন।

'তোমার জন্য স্পেশাল কিছু আনব?'

'না। পারবে তো তুমি? প্রেসারের ওষুধ খাচ্ছ না...'

'পারব। আর কিছু হলেই বা কী?'

'শোন! যদি কাঠি আইসক্রিম পাও...'

সিড়ির ল্যান্ডিংয়ের আড়ালে চলে গিয়েছিলেন অমিতেশ। সামান্য ঝুঁকে মাঝে তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলেন সুদক্ষিণা। তারপর পুরো হারিয়ে গিয়েছিলেন। শুধু হাতটা সিঁড়ির রেলিং ধরে নেমে যেতে যেতে মাঝে মাঝে থমকাচ্ছিল। বোধহয় শ্বাস নিচ্ছিলেন। এত দূর থেকে সেই হাতের বলিরেখা দেখা যায় না। গলার কাছে একরাশ কান্না এসে আটকাচ্ছিল সুদক্ষিণার। বুবান শেষ এসেছিল প্রায় বছর পনেরো আগে। ততদিনে নাতি রুবান হয়ে গিয়েছে। অমিতেশ আর সুদক্ষিণা রুবানকে দেখতে চেয়েছিলেন খুব। কিন্তু বুবান একাই এসেছিল কাজ নিয়ে। বউ ঊর্মির নাকি আগের বার এসে খুব কষ্ট হয়েছে এই উঁচু ফ্ল্যাটে। তাছাড়া সুদক্ষিণা-অমিতেশ সেকেলে... রুবানকে আর দেখা হয়নি তাঁদের। শুধু আইফেল টাওয়ারের সামনে দাঁড়ানো বুবান-ঊর্মি-রুবানের একটা ছবি সুদক্ষিণার সেকেলে ড্রেসিং-টেবিলের উপর চিরুনি, সিঁদুরের কৌটো আর অনেকগুলো রাবার ব্যান্ডের মাঝে পাকাপাকিভাবে জায়গা করে নিয়েছিল। অথচ এই ছেলেকে ঘিরেই সব কিছু ছিল সুদক্ষিণার। রেজাল্ট বেরনোর আগে কী প্রচণ্ড টেনশান। এইবারও নাইনটি পারসেন্ট পাবে তো। 'তোমার টেনশান তো আমার থেকেও বেশি, মা।' বুবান হাসত। 'তুই কী বুঝবি।' দেখাতো দূর, কথাই হয় না কতদিন। আজ একবার কথা বলতে পারলে ভাল হত। বলা যায় না, হয়তো বলত, 'মা, তোমরা দু'জন আমার কাছে চলে এস।' বসার ঘরের টেলিফোনটার দিকে তাকালেন সুদক্ষিণা। তাঁদের দু'জনের

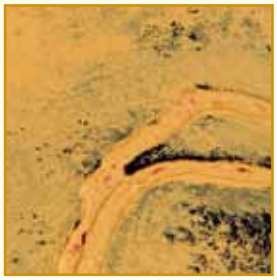

অমিতেশ দাঁড়িয়ে সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ের পাশে। এতগুলো সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসার পর আর পারছেন না। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে। মুখ প্রায় হাঁ হয়ে গিয়েছে। বাজারের থলেটা রাখা মেঝেতে। আর এক হাতে ধরা প্লাস্টিকের প্যাকেট। আট ন'টা সিঁড়ি। সুদক্ষিণা উড়ে এসেছিলেন প্রায়। আঁচলের খুঁট দিয়ে মুছে দিয়েছিলেন অমিতেশের ঘামে ভেজা মুখটা। 'তুমি... শরীর খারাপ লাগছে খুব?'

মতই অচল। লাইন কাটিয়ে দিয়েছিলেন অমিতেশ। টেলিফোনের বিল দেবে কে? শুধু রিসিভারটা থেকে গিয়েছে। ওটা উনি কিনেছিলেন সখ করে। বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এলেন সুদক্ষিণা। অতি ধীরে হেঁটে যাচ্ছেন অমিতেশ। মাইকের গান বদলে গিয়েছে কখন। লালনের পর চটুল হিন্দি গান 'খোয়াবোঁ কি ডোর টুটে না ইয়ার।' সুদক্ষিণা অমিতেশের হেঁটে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকেন একদৃষ্টে। পেটের মধ্যে কেমন যেন একটা গুড়গুড় করা ভয়। ঠিক বুবাইয়ের পরীক্ষার আগে যেমন হত। কোলন ক্যান্সার ধরা পড়েছিল সুদক্ষিণার। পরের দিনই ব্যাংকে ছুটেছিলেন অমিতেশ। কুড়িয়ে বাড়িয়ে লাখ দশেক টাকার এফ ডি। সুদের টাকাতেই সংসার চলত দু'জনের। চিকিৎসার জন্য সব টাকা খরচ করে ফেলায় আপত্তি ছিল সুদক্ষিণার। অমিতেশ শোনেননি। শেষ টাকাটা পর্যন্ত চিকিৎসা করিয়েছিলেন। ফ্ল্যাটটাও মর্টগেজ দেন চড়া সুদে।

অমিতেশ ফিরে এলেন ঘণ্টাদুয়েক পর। উৎকণ্ঠায় সুদক্ষিণা প্রায় কুঁকড়ে গিয়েছিলেন। বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন ঠায়। দূর গলির মোড়ের কাছে যখন আবার দেখা গিয়েছিল অমিতেশের এক ঝলক, সুদক্ষিণা আর পারেননি। ছুটে গিয়েছিলেন দরজার কাছে। দরজার পাল্লা খুলে দাঁড়িয়েছিলেন রেলিং ধরে প্রায় ঝুঁকে পড়ে।

বিয়ের পরপর ফিরতে রোজই দেরি হত অমিতেশের। দুটো টিউশানি অফিসের পর। সংসারের সব কাজ সেরে সুদক্ষিণা যখন শুতে আসতেন তখন ঘুমে চোখদুটো ঢুলে পড়ত। অথচ সারাদিনের পর ঐটুকুই সময় পরস্পরকে কাছে পাওয়ার। কথা বলার। তবু সেইটুকুও বলা হত না অনেকদিন। কথা বলতে বলতেই অমিতেশের নাকের ডাক শুনতে পেতেন তিনি।

অমিতেশ দাঁড়িয়ে সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ের পাশে। এতগুলো সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসার পর আর পারছেন না। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে। মুখ প্রায় হাঁ হয়ে গিয়েছে। বাজারের থলেটা রাখা মেঝেতে। আর এক হাতে ধরা প্লাস্টিকের প্যাকেট। আট ন'টা সিঁড়ি। সুদক্ষিণা উড়ে এসেছিলেন প্রায়। আঁচলের খুঁট দিয়ে মুছে দিয়েছিলেন অমিতেশের ঘামে ভেজা মুখটা। 'তুমি... শরীর খারাপ লাগছে খুব?' কোনমতে শ্বাস নিতে নিতে অমিতেশ মুচকি হাসার একটা চেষ্টা করেছিলেন। বাঁ হাতের প্যাকেটটা তুলে ধরেছিলেন সামান্য। প্যাকেটের ভিতর রঙচঙে প্লাস্টিকে মোড়া জিনিসদুটো। সুদক্ষিণা চিনতে পেরেছিলেন। কাঠি-আইসক্রিম।

মানুষটাকে কোনমতে সিঁড়ি দিয়ে টেনে তুলেছিলেন সুদক্ষিণা। জড়াজড়ি করা দুটো শরীর সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরছিল খুব জোরে। 'শুয়ে নাও একটু।' অমিতেশ শুয়ে পড়েছিলেন সোফার উপর। ভয় করছিল সুদক্ষিণার। থলেটা পড়ে আছে। আবার নামতে হবে সিঁড়ি দিয়ে। কব্জির কাছে আলতো স্পর্শে তিনি আবার ফিরে তাকিয়েছিলেন। 'কী হল? শরীর খারাপ লাগছে খুব।'

'আ...'

'ডাক্তার ডাকব?'

অমিতেশ হাতটা নাড়েন আবার। নিঃশ্বাস ফেলেন খুব জোরে। টেনে টেনে বলেন, 'কিচ্ছু করতে পারলাম না।'

'কী পারলে না। থাক না এখন। একটু বিশ্রাম...'

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই অমিতেশ আবারও বলে ওঠেন। 'আমি না কিচ্ছু করতে পারলাম তোমার জন্য।'

সুদক্ষিণার হাতটা নিজে থেকেই উঠে গিয়েছিল মুখের কাছে। ভিজে এসেছিল চোখের কাছটা। আঁচলের খুঁটটা ধরে তিনি মুখটা মুছিয়ে দিয়েছিলেন অমিতেশের। হাতটা রেখেছিলেন গালে। 'অনেক তো করলে... বরং আমিই... সারাজীবন...।' গলাটা ধরে এসেছিল। অমিতেশের বুকের উপর মুখ রেখে কেঁদে উঠেছিলেন তিনি।

প্লেটে মাছের ঝুরো। ওল চিংড়ি। সর্ষে দিয়ে পাবদা মাছ। অমিতেশ গোগ্রাসে গিলছিলেন। 'ভেবেছিলাম একটু মাংস আনব। টাকা ছিল না... একি তুমি খাচ্ছ না কেন?' ভাতের মধ্যে আলুসিদ্ধটা চটকাচ্ছিলেন সুদক্ষিণা। 'তুমি খাও।'

'না না। একি... তোমার আছে তো?'

'যা এনেছ, তাতে দু'জনের একবেলা খাওয়ার পরেও বেঁচে যাবে।'

'কিন্তু তুমি শুধু আলুসিদ্ধ দিয়ে খাবে? আলুসিদ্ধই তো খেয়েছি এতদিন ধরে... তাহলে আমি আমার একার জন্য... না না...' গামলা থেকে মাছ তুলে সুদক্ষিণার প্লেটের ওপর দিয়ে দেন অমিতেশ।

'দিও না। দিও না। যাহ। ষষ্ঠীর দিন আমিষ দিয়ে দিলে!'

মুহূর্তে চুপসে যান অমিতেশ। 'তোমার খাওয়া নষ্ট করলাম আমি!'

'না! না! আচ্ছা আমি খাব না হয়। এতবছর তো করেই এলাম।'

খাবারগুলো খুঁটেখুঁটে সামান্য খান সুদক্ষিণা। মনের মধ্যে খচখচ করতে থাকে। ছেলেটা নাতিটা কতদূরে। অথচ তিনি আমিষ খেয়ে ফেললেন।

'সকালবেলা বললে না কেন? তাহলে শুধু নিরামিষই আনতাম। একটা দিন। তুমি আমার কথা কখনো...'

'খেলাম তো। জানো কতদিনের একটা ইচ্ছে ছিল। একবার জাহাজে চড়ব। চারদিকে ঘন নীল সমুদ্র। তার মধ্যে একটা জাহাজ... ছোটদিরা আন্দামান গিয়েছিল মনে আছে? ছবি দেখিয়েছিল।'

'মনে আছে। বুল্টিদিরা ছবি দেখিয়েছিল। আমরাও...কিন্তু যাওয়া আর হল কই। সমুদ্র বলতে শুধু দীঘা...'

'বুবানকেও বলেছিলাম অনেকবার। যদি একবার জাহাজে চড়তে পারতাম!'

অমিতেশ চুপ করে থাকেন। খাবার বাসনগুলো গোছাতে থাকেন সুদক্ষিণা।

'তুমি কী আজও বাসন মাজবে নাকি?'

'অনেকটা খাবার রয়ে গেল।'

'হা... হা... এতদিন ধরে কী খেয়েছি আর আজ...'

'খাবারগুলো নষ্ট করব? একটা প্যাকেটে করে ফেলে এলে হত। বিড়াল কুকুরগুলো খেতে পারত।'

'দাও, ফেলে আসি।'

'নাহ থাক। তোমাকে আর নামতে হবে না।'

'নষ্ট করবে?'

'একটা থালায় জড় করে বারান্দায় রেখে আসি। কাকে খেয়ে নেবে।'

'বাসন মাজতে যেও না কিন্তু।'

বৃদ্ধ, সামান্য কুঁচকে যাওয়া ত্বকের উপর দিয়ে গড়িয়ে নামছিল লাল তরল। গলে যাওয়া আইসক্রিম। সুদক্ষিণা আলতো করে চেটে নিলেন পুরোটা। জানলা খোলা। পড়ন্ত দুপুরের রোদ শেষবারের মত জ্বলে উঠতে গিয়েও হোঁচট খাচ্ছিল শরতের সাদা মেঘে। মাইক এখন আরো চটুল–

'আরে লড়কি বিউটিফুল কর গয়ি চুল।'

খাটের উপর আধশোয়া অমিতেশ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলেন সাইকেলের টিং টিং। ফর্সা, রোগা একটা মেয়ে ছাতা মাথায় হেঁটে ফিরছিল স্কুল থেকে। পিছনে ফিরে তাকিয়েছিল অমিতেশের সাইকেলের বেল শুনে। অমিতেশ ঝটতি মাথা নামিয়ে নিয়েছিলেন। যেন সাইকেল চালাতে চালাতে প্যাডেল ছাড়া আর কোথাও তাকাতে নেই। তখনও চিঠি দেওয়ার সাহস হয়নি তাঁর। সুদক্ষিণা হঠাৎ ফিরে তাকান অমিতেশের দিকে। সেই প্রথম যেমন তাকিয়েছিলেন। অমিতেশ মুখ ফেরান না। এতদিন পরেও যেন আবার লজ্জা পান সুদক্ষিণা। আরক্ত হয়ে ওঠে তাঁর মুখ। চোখ নামিয়ে নেন হঠাৎই। খাট থেকে উঠে পড়েন অমিতেশ। এক পা দু'পা করে এগিয়ে যান স্পর্শের দূরত্বে। মুখটা আঁকড়ে ধরেন। মুখের আরো কাছে যেতে চান। পারেন না। বৃদ্ধ পাঁজর থেকে দমকে দমকে বেরিয়ে আসে কাশি। জল বাড়িয়ে দেন সুদক্ষিণা। অনেকটা জল খান অমিতেশ। সুদক্ষিণার জানলার পাল্লাদুটো বন্ধ করে দেন। মাইকের আওয়াজ কমে যায়। কিন্তু গানের গুম গুম বিট পাক খায় বন্ধ ঘরের ভিতর।

'কিছুই পারলাম না।'

'কমই বা কী পারলে। করলে তো সবার জন্য।'

'তারপর নিজে পেনিলেস।'

'একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? সত্যি বলবে?'

'কী?'

'বুবানকে ফোন করে কি সত্যিই পাওনি তুমি?'

অমিতেশ গুম হয়ে যান। 'যেদিন তোমার অপারেশনের কথা হল। সেদিন অনেকবার করেছিলাম। প্রথমে তোলেনি। তারপর...'

'তারপর?'

'কে একজন তুলেছিল। ফরাসিতে কী বলেছিল আমি বুঝতে পারিনি।'

'বাবা-মায়ের খবরও নেবে না একবার? মেয়েটার যে আমাদের সঙ্গে কী শত্রুতা...'

'আর আমাদের ছেলে? নিজেরই তো ছেলে।'

সুদক্ষিণা অন্যদিকে তাকান।

'কুসুমপুরে জানো... যেখানে মেজমামা থাকত। ওখানে ছোটবেলায় আমার এক বন্ধু ছিল। সুবল।'

'কুসুমপুরে?'

'ছেলেটা একটু পাগল ছিল। বলত একরকম পিঁপড়ে আছে... নীল পিঁপড়ে।'

'নীল পিঁপড়ে!'

'ভুলেই গিয়েছিলাম সুবলের কথা। আজ সকালে মনে পড়ল। সেই নীল পিঁপড়ে ধরে মুঠির মধ্যে পুরে একটা মন্ত্র বলতে হবে– ইলি মিলি ডিলি গিলি হে। আর তাহলেই নাকি যা চাইবে সব সত্যি হবে।'

'মন্ত্রের কী ছিরি! তুমি বিশ্বাস করতে?'

'ছোট তো তখন। কুসুমপুর থেকে ফেরার পরেও অনেকদিন খুঁজতাম। পাগলের মত। আজ মনে হল... আমি... আমরা নিজেরাই নীল পিঁপড়ে। সবাই হাতের মুঠোয় ধরেছে। আর আমরা সবার ইচ্ছা মিটিয়ে গিয়েছি। আচ্ছা নীল পিঁপড়েদের নিজেদের কোন ইচ্ছা থাকতে নেই। দুটো খেতে পাওয়া... ভারি দুটো খেতে পাওয়া সেও...।'

সুদক্ষিণা কেঁদে ওঠেন। 'জানো আজ সকালে স্বপ্ন দেখেছি। রুবান ফোন করেছে। বলছে দাদু-দিদা তোমাদের নিতে আসছি আমরা... জানো...সত্যি বুবান-ঊর্মি ওদের কী...' অমিতেশ হাত রাখেন সুদক্ষিণার কাঁধে। 'চল আর দেরি করব না।'

'এখনই?'

'যত দেরি করব তত মন খারাপ হবে। চেষ্টাতো করলাম এতদিন ধরে। পুরিয়াগুলো কোথায়? থলের মধ্যেই?'

'ফোন বাজছে না? ফোন... বুবান বোধহয়...' সুদক্ষিণা দৌড়ে উঠে যেতে যান।

'পাগলামো কোরো না। শোন... ফোন বাজবে কী করে...' অমিতেশ সুদক্ষিণাকে ধরে ফেলেন। 'লাইন কেটে দিয়েছে কবে।' সুদক্ষিণা এইবার ডুকরে কেঁদে ওঠেন। কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়েন মাটিতে।

'শোন। লক্ষ্মীটি শোন। আমাদের কী আর কোন উপায় আছে? আচ্ছা আমরা তো আগেই কথা বলে নিয়েছিলাম। এই বয়সে নতুন করে কী আর... এই বয়সে এই শরীর নিয়ে... এমনিতেও কদিনই-বা...ওঠ। উঠে পড়। চোখে মুখে জল দিয়ে নাও।'

ইঁদুর মারা বিষের অনেকগুলো পুরিয়া অমিতেশ নিয়ে এসেছিলেন বাজার থেকে। খাবারে মেশালেই হয়তো ভাল হত। কিন্তু সুদক্ষিণাই রাজি হননি। শেষ খাবারের স্বাদটুকুও নষ্ট হোক চাননি। সুদক্ষিণা থম মেরে বসেছেন। চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে অঝোর ধারায়।

'ওঠ। এই নাও।'

তালুর মধ্যে দুটো নীল পিঁপড়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে অমিতেশের হাতের। হাতটা বাড়িয়ে দেন অমিতেশের দিকে।

সমুদ্রের হাওয়ায় সুদক্ষিণার চুল উড়ছিল। উড়ে যাচ্ছিল গায়ের চাদর। অমিতেশ ধরে চাদরটা ঠিক করে দেন। জাহাজের সাইরেন বেজে ওঠে সশব্দে।

শমীক ঘোষ
ভারতের ছোটগল্পকার

বাংলাদেশ-ভারত
মৈত্রী সমিতি

হোমটাউন প্রজেক্ট, লেভেল # ১৬, সুট # ১৫বি
৮৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
E-mail: info@bifs.org.bd, b_ifs@yahoo.com
(জিপিও বক্স # ৭৭৫)
ওয়েবসাইট: www.bifs.org.bd

ABSSI
Association of Bangladeshi Students Studied in India

ভারতে উচ্চশিক্ষা লাভকারী শিক্ষার্থী সমিতি
President: Dr. Dalem Chandra Barman
VC, ASA University, Dhaka
Phone: 01552 334300
Secretary: Shamim Al-Mamun
Phone: 01715 902146

পরমেশ

অমানিতা সেন

১.
সুনীলের নীরার মত আমারও ইচ্ছে করে
সৃজন করি কোন মানসপুরুষ।
ধর, নাম দেব তার পরমেশ।
নামটা সেকেলে হলেও
আদ্যোপান্ত সে হবে একেলে।
খাদ্যরুচি তার– প্রাদেশিক নাকি নয়?
সোশ্যাল মিডিয়াতে সে আছে, না নেই।
সে কি মানুষ না ঈশ্বর?
এই সব প্রশ্ন, গবেষণায় আমিও হব
টানটান বা উদাসী।

কুয়াশা, ঝড়, বৃষ্টি,
মেঘ-রোদের কানাকানি,
সব বিছিয়ে দেব তার পায়ে।
সে এসে দাঁড়ালে, আকাশে বিদ্যুৎ।
তার হাসিতে সূর্যোদয়,
মন খারাপে, গাছেরাও নিস্পন্দ।
কোন এক সাদা শার্টে ব্লু জিনসের বিকেলে
এক আকাশ তারা জ্বলে ওঠার
আগের মুহূর্তে,
যখন বিজ্ঞাপনী আলো হবে ম্লান
আমি গিয়ে দাঁড়াব ওর পাশে।

নাম ধরে ডাকব দু'বার,
আলতো করে আঙুল ছোঁয়াব
জিলেট-মাখা গালে
বলব, 'তুমি আমার মুক্তি পরমেশ
তুমিই দিতে পার আমায় অমরতা।'
ঠিক নীরার মত।

২.
সূর্যমুখী মানে ভ্যানগগ্,
সোনাটা মানেই বিঠোফেন,
কিলিমাঞ্জারো যেমন হেমিংওয়ের,
বনলতা সেন জীবনানন্দের,
পূর্ণেন্দু পত্রীর এই লাইনগুলো নিয়ে
কথা হচ্ছিল পরমেশের সঙ্গে।
সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার সম্পর্ক
কেমন তারা পরিপূরক একে অপরের,
এই ছিল সেদিনের আলোচনার বিষয়।
হঠাৎ প্রশ্নটা করল ওই
'আচ্ছা এমন তো হতে পারে যে
পরমেশ মানে তুমি,
এই হবে আমাদেরও পরিণাম।'
বলেই ওর সেই বেমক্কা হো হো হাসি।
সেই হাসিতে আবার আমার
আকাশ-মাটি কম্পমান।
বরাভয়, শান্তি, চির আনন্দের আশ্বাস
সেই হাসিতে এক মুহূর্তের জন্যে হলেও,
আমিও ঈশ্বরী।

অমানিতা সেন ভারতের কবি

দক্ষিণ ডিহি

অনীক মাহমুদ

বেণীমাধব, দক্ষিণ ডিহিতে এখন বেশ নির্জনতা পদ্মাসনে নেতিয়ে বসেছে,
ভবতারিণীর পদছায়া– ঠাকুর জামাইয়ের শাশুড়ি সংস্কার, ব্যঞ্জনের সমাদর
আঙিনার ঘাসগুলো কি জানে? আপনার গুহকোণে উঠোনে-ছমছায়-সিঁড়িতে-কুটঙ্কে
সবখানে অনিঃশেষ ঐকল্যের স্বেচ্ছাচার,
রবীন্দ্র-মাতুল ব্রজেন্দ্রনাথ-পিসি আদ্যাসুন্দরীর ঘটকলি
মহর্ষি প্রেরিত সদানন্দ মজুমদারের খেলনা ভূষণ, মিষ্টান্নের হরিলুট
আপনার বাড়িটার অন্তর্ভেদী হাহাকার জ্যোতিরিন্দ্র-কাদম্বরী-জ্ঞানদা-ইন্দিরার পাদস্পর্শ
স্থাণুর মতন শতাব্দীর স্মৃতিকুম্ভে লীন হয়ে আছে,
চেঙ্গুটিয়া-নরেন্দ্রপুরের গন্ধবহ পাত্রী সন্ধানের অভিযাত্রায় একাকার
ইটে ইটে একাকিত্বের গভীরতর শূন্যতার ডানা
শোকার্ত বিবস্বান প্রত্যুষাকে পিছে ফেলে লাল হয়ে ওঠে,
দক্ষিণ ডিহির নিসর্গখচিত গলিপথ শতাব্দীকে ভ্রুকুটি করে
অনন্ত বিরহ স্বপ্নলোকে কী গভীর কৃষ্ণক্ষত মেলে ধরে আছে!
লোক আসে লোক যায় স্মৃতিলোক ঘুরে বসে ক্ষুধিত পাষাণে
দৌড়দার শাল গায়ে পাত্রবেশী গুরুদেব অবনীন্দ্রের চোখে দিল্লির বাদশা
আইবুড়ো ভাতে পাতে বসে লজ্জানম্র কবিবর
ভাঁড় খেলতে বসে ভাঁড়গুলো উল্টে দিয়ে ধরেন সুরের পথ
বাসরগানে তাঁর কণ্ঠ ওঠে মেতে:
আ মরি লাবণ্যময়ী
কে ও স্থির সৌদামিনী
কাকীমা ত্রিপুরাসুন্দরী ওড়নায় মুখ ঢেকে জড়সড় রবিকাণ্ডে
তারও আগে হেরেম্বনাথ তর্করত্নের মন্ত্রপাঠ
শম্ভুনাথ গড়গড়ির পূজার্চনা দক্ষিণ ডিহি থেকে জোড়াসাঁকোর
ঠাকুরবাড়ি মহর্ষি ভবনে
ভবতারিণী থেকে মৃণালিনী– মাধুরী-মীরা-রথীন্দ্র-রেণুকার মাতা
টাইমমেশিন কি বৈদ্যুতিন চাঞ্চল্যে সবকিছু চাঙ্গা করে দেয়!
দক্ষিণ ডিহি বড় বেশি স্মৃতিভারাতুর সময়ের গল্প বলে
অনন্ত কথায় অনন্ত ইশারায় স্মৃতিদগ্ধ বিবর্ণ বারান্দায়...

[রবীন্দ্র-শ্বশুরবাড়ি পরিদর্শনের পর]

চিঠি
সাবিনা ইয়াসমিন

তোমাকে লেখা চিঠিখানা কালকে জলে ভিজেছে
আজ তাকে রৌদ্রে শুকাব
আজ তাকে পায়রার পায়ে বাঁধব
মেঘদূতে ওড়াব।

ভাঁজ খুলে দেখ
চিঠিখানায় আছে অনেক কোমল খবর
শঙ্খভর্তি কলসের খোঁজ
স্রোতের উজানে ভাসার সম্ভাবনার ইশারা।

চিঠিখানা পড়ে দেখ
সেখানে রয়েছে চন্দনগুঁড়ো জ্যোৎস্নার আলো
পোড়া বনভূমির ওপারে থাকা
মায়াবতী হরিণীর ডাক
বিরহমাখা কিছু জাগরণবেলা।

চিঠিখানা আজ আমি
রৌদ্রে শুকাব
পায়রার পায়ে বাঁধব
মেঘদূতে ওড়াব।

প্রেম
অমিতাভ চক্রবর্তী

হৃদয় যখন প্রাজ্ঞ মহাস্থবির শ্রমণ
ছোঁয়া না ছোঁয়ার লুকোচুরি খোলায়,
শহরতলীর সেই পুরনো বনবিবির মেলায়,
বাঘ হয়ে শিকার খোঁজে প্রস্ফুটিত হৃদয়!

ভাবনার দরজা খুলে সমুদ্রের ঢেউ-গোনা,
যৌবনের ময়দানে তোমার হঠাৎ আগমন;
শ্রাবণের কৃষক জানে মুঠো-মুঠো ধানবোনা
সান্ধ্য টিভির পর্দায় তোমার মুখ দেখা বিস্ময়!

শীতের সকালে তোমার দীর্ঘ হাই-তোলা মুখ,
আমার অসুখ সারার পর আশ্চর্য প্রাপ্তি;
তারপর ভেজা-শরীর থেকে ঋতুমতী উত্তাপ,
আমার মতন শংখচূড় সাপকেও বশীকরণ মন্ত্রে
বানাল এক রঙিন প্লাস্টিক-খেলনা!

তোমার সরু কোমরে এখন নতুন প্রেমিকের
কামার্ত হাত, আমাকে প্রত্যহ খণ্ড-বিখণ্ড
কালো পাথরে পরিণত করে, এভাবে এক-একা
এখন, একলব্যের স্বেচ্ছা নির্বাসন, শূন্য-জীবন
তোমাকে আলিঙ্গন আকাঙ্ক্ষায় আজো আকুল হৃদয়!

অমিতাভ চক্রবর্তী ভারতের লেখক

স্মৃতির বিষাদ
দীপক লাহিড়ী

শরতের বাতাস স্তম্ভিত ঠেক খেয়ে আছে
ঝরে পড়া শিউলি ফুলের গায়ে
আমি নদীর কাছবরাবর খোঁজ করি
ভাঙা চাঁদের আলো– অবন পল্লীর
লাল রাস্তা কংক্রিটে সেজেছে, হারিয়ে যাচ্ছে
পলাশ, খোয়াই আর বুনো পথগুলো
এখন আলোর দেশ থেকে ঘন হচ্ছে অন্ধকার
জলজ পতঙ্গের মত মোটরবাহিত হয়ে
ছুটে যাচ্ছে এদিক ওদিক যুবকের দল, পূর্বপল্লীর
শান্ত নিস্তব্ধতায় হীরামন পাখির ডাক
গাছগাছালির ফাঁকে কেবল এখনও জেগে আছে
এখানে হেমন্তের মৃদু আভাস ঘাসের আগায়
লাফিয়ে নমেছে চাঁদ শিশিরের মুক্ত বিন্দুর সাথে
অদ্ভুত উদাসীন প্রকৃতির মধ্যে বিনুনী বাঁধছে
সময়ের রুদ্র জটাজাল, মায়াবী হরিণ
পাক খাচ্ছে সময়ের গভীর অরণ্যে
এই পালটে যাওয়া অস্থিরতা ছাপিয়ে
বৃশ্চিকের মত রোদ মেঘের আড়ালে সূর্যাস্তের
রঙবদল প্রত্যক্ষ করছে– হারিয়ে যাওয়ার
গভীর শব্দ ছবির ও কবিতার শূন্য অহংকার
নিয়ে পড়ে আছে এক স্মৃতির বিষাদে।

দীপক লাহিড়ী ভারতের কবি

আগ্রাসন
পৃথ্বীশ চক্রবর্তী

প্রথমেই করেছিলে গ্রাস চাষের জমিন
এরপর এক এক করে নিয়ে গেছ
শরতের চরে জেগে ওঠা কাশবন
তীরের ধারের সারিবাধা গাছপালা
আমার ছেলেবেলার সেই খেলার মাঠটি
গ্রামের শ্মশানঘাটটিও তোমার রাক্ষুসী
করাল থাবায় শেষ হয়ে যাচ্ছে
মনে হচ্ছে, একদিন সারা গ্রামটিই খেয়ে নেবে
গ্রাস করবে– পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি-ঘর
আমাদের তুমি গ্রামছাড়া করেই ছাড়বে
কেউ না বুঝুক, আমি বুঝেছি ঠিকই
সাম্রাজ্যবাদী তোমার মনোভাব

বন্ধ কর নদী মনের আগ্রাসী সাধ
নতুবা তোমার তীরে দেব বেড়িবাঁধ।

ছোটগল্প

কুয়াকাটায় দুই নারী

সালেহা চৌধুরী

মমতা আর মিমি ঠিক করল কুয়াকাটায় পাঁচদিন থাকবে। ওরা দুজন মা ও মেয়ে। মমতা পঞ্চান্ন আর মিমি পঁচিশ। মমতার স্বামী মানে মিনির বাবা বিদেশে গিয়ে আর ফিরে আসেননি। পাঁচ বছর হল বিদেশে। গিয়েছিলেন তিন বছরের জন্য। সকলে বলে– তিনি ওখানে একজন অপূর্ব সুন্দরী নারীর সঙ্গে বসবাস করছেন। ইংরেজিতে যাকে বলে– লিভ টুগেদার। যখন ওরা বুঝতে পারে ঘটনা সত্যি, ইংরেজিতে এমএ পাশ মিমি বলে– মা ইউ ডু দ্য সেম থিং। ফাইন্ড সামবডি এ্যান্ড লিভ টুগেদার। মমতা বলে– আমি কী তোর আব্বুর মত সিলি?

মিমি বলে– এই পৃথিবীতে ভাল মানুষের দাম নেই।

সেটা আমার ভাবনা।

ঠিক আছে। ডু হোয়াট ইয়োর হার্ট ফান্সি।

ওরা দুজন তখন ঠিক করে কুয়াকাটায় পাঁচদিন থাকবে। মমতা বলে মেয়েকে– পাঁচদিন তুমি ইংরেজি বলতে পারবে না। সবসময় বাংলা বলতে হবে। কথায় কথায় ইংরেজি।

কেন অসুবিধা কী?

আমার আর কী অসুবিধা। অসুবিধা তোমার। একটা বাক্য বাংলায় বলতে গেলে ইংরেজির সাহায্য নেওয়া।

ঠিক আছে মাদার। সরি মা।

ঢাকা থেকে ৩২০ কিলোমিটার দূরে যে জায়গা সেটা এমন কিছু দূরে নয়, কিন্তু কুয়াকাটা এক্সপ্রেস বাসটা দু'বার

মাঘী পূর্ণিমায় ইচ্ছা করলে অনেক রাত পর্যন্ত বিচে থাকতে কোন অসুবিধা হবে না। হোটেলের ভেতরে ঝকঝকে পানির পুকুর আছে। যেখানে লাল শাপলা ফোটে, ফোটে আরো নানা ফুল। সেখানে চেয়ার টেনে বসে চা খেতেও বেশ। ঘরে পাশাপাশি দুটো বেড মা ও মেয়ের জন্য। সাইড টেবিল। ফোন। টেলিভিশন। এইসব। সবচেয়ে ভাল লাগলে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সমুদ্র।

বিগড়েছে বলে জায়গাটা মোটেই কাছে নয়। অনেক আগে একবার এসেছিল ওরা। ওরা তিনজন। তখন অনেক ফেরি ছিল। এখন অনেকগুলো ব্রিজ হয়ে গেছে। মোটামুটি ভাল। ওরা প্রথমে লঞ্চে বরিশাল আসতে চেয়েছিল তারপর সেখান থেকে বাসে কুয়াকাটায়। তারপর কী ভেবে ওরা কুয়াকাটা এক্সপ্রেসে কুয়াকাটায় আসে। মমতা একটা ব্যাংকে ভাল কাজ করে। ডেডিকেটেড ওয়ার্কার। সরকারি আর সাপ্তাহিক ছুটি ছাড়া ছুটি নেয় না। এখন মেয়ের জন্মদিনে একটা কিছু দিতে চাইলে মেয়ে বলে– চল দুজনে মিলে কোথাও যাই। সেটাই হবে আমার জন্মদিনের গিফ্‌ট।

সামনে মাঘী পূর্ণিমা। অতএব একটা চাঁদভরা রাত সমুদ্রের ধারে কাটানো যাবে সেটাই বা কম কী? ঢাকায় চাঁদ ওঠে কিন্তু সে চাঁদ নিয়ে কেউ কোন বাড়াবাড়ি করে না। দু'একটি রোমান্টিক হৃদয় ব্যতিক্রম।

ওরা ঠিক করল 'বিচ হাভেন' হোটেলে উঠবে। প্রথম কথা হোটেলটা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। একটা রুমের জন্য প্রতি রাতে দুই আড়াই হাজার টাকা দিতে হবে। আর এখান থেকে সমুদ্র মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ। মাঘী পূর্ণিমায় ইচ্ছা করলে অনেক রাত পর্যন্ত বিচে থাকতে কোন অসুবিধা হবে না। হোটেলের ভেতরে ঝকঝকে পানির পুকুর আছে। যেখানে লাল শাপলা ফোটে, ফোটে আরো নানা ফুল। সেখানে চেয়ার টেনে বসে চা খেতেও বেশ। ঘরে পাশাপাশি দুটো বেড মা ও মেয়ের জন্য। সাইড টেবিল। ফোন। টেলিভিশন। এইসব। সবচেয়ে ভাল লাগল ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সমুদ্র। মনে মনে ভাবে মমতা বেশ কয়েক বছর আগে যখন এসেছিল ও, বয়স ছিল কম। প্রায় দশ বছর আগে বোধহয়। ওরা তিনজন। ও, আশেকুর রাহমান আর মেয়ে মিমি। আশেকুর এখন অন্য আশিকে মগ্ন। খুব কী কষ্ট পেয়েছিল মমতা? কেমন একটা ভোঁতা অনুভূতি। এখনো তাই। মিমি চিৎকার করে ডাকছে– মা মা চল পুকুরপাড়ে গিয়ে বসি। কী চমৎকার টলটলে পানি।

একজন সেখানে আগে থেকে বসেছিলেন। ওরাও বসল। ভদ্রলোক ওদের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলেন। ওদের মনে হল এই ভদ্রলোক বোধহয় বিদেশে থাকেন। এখানে কেউ কারো দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসে না। মুখ গম্ভীর করে রাখে। ভাবে হাসাটা বাচালতা।

লোকটার বয়স কত? তিরিশ আর চল্লিশের মাঝামাঝি। দেখতে ভাল। স্মার্ট। চোখের সানগ্লাশটা বেশ চমৎকার। ভদ্রলোক শাপলার দিকে তাকিয়ে চা পান করছেন। ছোট টেবিলে কতগুলো বিস্কুট। তিনি ওদের দিকে তাকান। তারপর যেন আপনমনে কথা বলছেন এইভাবে বলেন– এই বাংলাদেশ যে এত সুন্দর বিদেশে থাকতে সেটা বুঝতে পারিনি। এই যে সামনের পদ্ম-শাপলা ফোটা পুকুর এত সুন্দর দৃশ্যও হয়?

মমতা বলেন– আপনি বিদেশে থাকেন? কোথায়?

লসএ্যাঞ্জিলিসে।

ও। সেই ভদ্রলোক আবার বলেন– মা-বাবার সঙ্গে ছোটবেলায় গিয়েছিলাম। ওরা ফিরে এসেছেন। এখন এখানে থাকেন। আমি ছুটি শেষ হলে ফিরে যাব।

এত ভাল লাগছে তাহলে থেকে যান। ফট করে বলে মিমি।

সেটা সম্ভব নয়। চাকরি এবং আরো নানা অসুবিধা।

ঠিকমত বাংলা না জানলে এখন কিন্তু বাংলাদেশে চাকরি হয় না।

সেটা তাহলে সবচেয়ে বড় অসুবিধা।

ওরা সকলে একসঙ্গে হেসে ওঠে।

আমি অয়ন কাজল।

আমি মিমি আর উনি আমার মা মমতা।

মা? ভদ্রলোক বলেন– আমি ভেবেছিলাম আপনারা দুই বোন।

অনেকেই ভাবেন। মিমি বলে। মা একটু লজ্জিত হন। মিমি বাবার মত ধবধবে ফর্সা। মায়ের রং এত বেশি সাদা নয়। গাছপালার ছোঁয়া লাগা সবুজ-শ্যামল। তবে মিল আছে চোহারায়। মায়ের মুখে বয়সের রেখা পড়েনি। আর মিমি তো পঁচিশ বছরের সাইকেল চড়া, টেনিস খেলা, জগিং ফেনসিংয়ের মেয়ে। এখন একটা কলেজে ইংরেজি পড়াতে শুরু করেছে তবে সুযোগ যে কোনদিন এসে যাবে বাইরে যাবার। ওর ইচ্ছা অস্ট্রেলিয়াতে যাবার। ইউ কে বা ইউ এস এ নয়। আরো ইচ্ছা অস্ট্রেলিয়াতে গেলে ওর মাকেও নিয়ে যাবে। সবই ইচ্ছা, সবই ভাবনা এখনো। এসব সত্যি হতে প্রচুর হার্ডল রেস, কাঠখড় পোড়ানো। তবে মিমির ধারণা ছয়মাসের ভেতরে সবকিছু হয়ে যাবে।

কতদিন থাকবেন? মিমি প্রশ্ন করে।

কোথায়? এখানে না বাংলাদেশে?

এখানে, এই হোটেলে?

আরো সাতদিন। কালই এলাম।

আপনারা?

পাঁচদিন।

ভদ্রলোক বলেন– তাহলে তো আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। খুব ভাল লাগছে। ভদ্রলোক ওঠেন– আমি একটু ভেতরে গেলাম। একটু কাজ আছে।

দুদিন পর মাঘী পূর্ণিমা। মিমি বলে।

চাঁদ, পূর্ণিমা এসব নিয়ে কোন ধারণা আছে আপনার। মানে এসব ভালবাসেন? আইমিন এনি আইডিয়া হাউ এ ফুল মুন ইন সি লুকস লাইক? তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে– সরি মা। মা বলেছেন কথায় কথায় ইংরেজি না বলতে।

ভদ্রলোক হাসছেন। বলেন– আমার মা-ও একই কথা বলেন। বলেন পুরো বাক্য ইংরেজিতে না হলে পুরো বাক্য বাংলায়। খিঁচুড়ি করে কথা বলবে না।

অয়ন কাজল উঠে গেলে মিমি বলে– মনে হয় বেশ মিশুক আর বেশ সফিসটিকেটেড ভদ্রলোক।

মা সফিসটিকেশনের বাংলা কী?

একটু ভেবে মমতা বলেন– পরিশীলিত।

ওরা ভেবেছিল ওদের আগে আর কেউ সমুদ্রে যায়নি সূর্যোদয় দেখতে। ওদের ধারণা ভুল। অনেক লোক এসে গেছে। আর ওদের মধ্যে একটা সুন্দর নীল সোয়েটার আর ট্রাউজারে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখছেন অয়ন কাজল।

সুপ্রভাত! মিমিই বলে প্রথমে।

অয়ন কাজল হাসতে হাসতে বলে– সুপ্রভাত।

এ কথা সে কথা। কখনো চুপ করে থাকা। সূর্যটা উঠে আলো ছড়ায়। ওরা ঠিক করে এবার ফিরে ব্রেকফাস্ট সেরে নিতে হবে। তারপর? অয়ন কাজল মোটর সাইকেল ধার করেছেন বা ভাড়া নিয়েছেন। সেটা নিয়ে তিনি ছুটবেন। মিমি বা মমতা যদি চান ওদের সঙ্গে নেবেন। ওরা কিছু বলে না। চুপ করে কী ভাবছে। অয়ন কাজল বলেন– এক সময় মিমিকে ঘুরিয়ে তারপর আপনাকে নিয়ে যাব। যাবেন?

অয়ন কাজল বলেন– এখানে আরো অনেক কিছু আছে। আমার বাবা একটা লিস্টি বানিয়ে দিয়েছেন। এই বলে পকেট থেকে বাবার হাতে লেখা লিস্টিটা বের করে। মিমি আর মমতা ঝুঁকে পড়ে লিস্টির উপরে। মমতা বিচের খাবার খেয়েছে। ওরা চা আর ডিম। এই অসাধারণ সৌন্দর্যের ভেতর খাওয়া নিয়ে কেউ এখনো কিছু ভাবছে না। চারিদিকে কোলাহল।

ওরা হাসছে। কেন নয়? অন্য এক অপরিচিত মোটর সাইকেল চালকের চাইতে আপনি কী বেশি ভাল নন। ওরা বুঝতে পেরেছে লোকটা গুন্ডাটুন্ডা তো নয়ই বরং বেশ সহজ একজন।

সেটা কী করে বলি আমি দক্ষ মোটর বাইক চালকের চাইতে ভাল কী মন্দ? ওরা তো অনেকদিন থেকে এ কাজ করছেন। আমি দু'দিন হল শিখেছি। বাবার জায়গাটা পছন্দ বলে উনিই টিকিট, থাকা সব ঠিক করে রেখেছিলেন। এরপর আরো নানা জায়গায় যেতে হবে। কুয়াকাটা ইজ এ গ্রেট প্লেস। একটি অসাধারণ জায়গা। বাবা চান তাঁর ছেলে দেশটাকে খুব গভীর করে ভালবেসে ফেলুক।

মিমিই প্রথমে মোটর সাইকেলে ওঠে। মমতা একটা চেয়ার ভাড়া করে সমুদ্র দেখছে। আর কী সব ভাবছে। বেশ তাড়াতাড়ি অয়ন কাজল আপন হয়ে গেছে।

বাতাসে মিমির গলার স্কার্ফ পাখা মেলে উড়ছে। আর অয়ন গান করছে। –লিন অন মি ইফ ইউ আর নট স্ট্রং...। বেশ গলা। মিমি বলে– আপনি বেশ গান করেন অয়ন কাজল।

গান আমার ধর্ম। ঈশ্বর বলে যদি কেউ থাকে তার কাছে যাবার পথ বা মাধ্যম। আপনি না ঠিক আছে তুমি বলছি– তোমার গান ভাল লাগে?

ভাল লাগে। তবে আমার মা গানপাগল। শোবার ঘরে, রান্নাঘরে, বসার ঘরে, ইস্ত্রি করবার ঘরে, কম্পিউটার ঘরে, সবখানে তার গান।

সাগরের উচ্ছ্বাস বা শব্দ কি সব পাখিদের আসা যাওয়া। মোটর সাইকেল ছুটছে সেই সবের ভেতর দিয়ে। আর মিমির মনে হল– গতির ভেতরে যে জীবন তেমন জীবন আর কোনখানে থাকে না। গতি বন্ধ মানে জীবন স্তব্ধ।

আমার মা বাংলা গান ভালবাসেন। আর পুরনো হিন্দি গান।

তুমি?

আপনি যা যা গাইছেন সবই আমার প্রিয়।

গানের সুরটা চারপাশ ভরিয়ে ওদের নিয়ে চলেছে কোন এক মন্দিরের দিকে।

থামারই-বা দরকার কী? যা দেখবার তার চেয়ে ভাল এই চলা। মন্দিরের চাইতে ভাল সাগর ধরে ছুটে চলা। বলে মিমি।

একটু বিশ্রাম হবে।

তা ঠিক।

ওখানে চা আর ডিম সেদ্ধ বিক্রি হয়। দুজনেই দুটো ডিম খেয়ে চা খেয়ে নেয়। বেশ লাগে। অয়ন কাজল বলেন– তোমার হবি কী মিমি?

বই পড়া, ছবি আঁকা আর সিনেমা দেখা।

তোমার হবিতে গান শোনা নেই।

ওটা হবি নয়। ভাল লাগলে শুনি।

আচ্ছা আপনি কি গান কোন ওস্তাদের কাছে শিখেছেন?

একজন শিখিয়েছিলেন। তারপর এখন নিজেই গাই। বিদেশে গান গাইবার ডাক পড়ে নানা পরবে।

আপনি কিছু বাজাতে পারেন?

ভায়োলিন আর গিটার। আর সুর তুলতে পারি কী-বোর্ডে।

আপনি তো অসাধারণ?

অয়ন কাজল হাসছে।

খুবই সাধারণ। এতদিন ওদেশে থেকেও মাছ-ভাতের জন্য মন হাহাকার করে।

মিমির খুব জানতে ইচ্ছে করে ভদ্রলোক কী বিবাহিত? তাঁর কী ছেলেমেয়ে আছে? কিন্তু ফট করে এমন একটা প্রশ্ন করতে বাধে ওর। বলে কেবল– পূর্ণিমা রাতে সাগর থেকে ফিরে আমাদের ঘরে তিন জনার একটা পার্টি হতে পারে। আপনি বাজনা বাজাবেন। মা কবিতা পড়বেন। আমি বললে একটা গান শুনিয়ে দেব। বলেই মিমি হাসে। ভদ্রলোক বেশ একটু মিষ্টি চোখে মিমির দিকে তাকিয়ে আছেন। কাজল টানা চোখ। কপাল ব্যান্ড অনুশাসিত চুলের ভেতরে সুন্দর হয়ে জেগে আছে। কিছু কুচো চুল এখানে সেখানে।

ফিরতি পথে মিমি ভদ্রলোকের কোমর জড়িয়ে চুপচাপ গান শুনছে। ভদ্রলোক কিন্তু কখনো হুল্লোড়ে গান করেন না। সবগুলোই মায়ের পছন্দের। মিমিরও খারাপ লাগছে না। মিমি মোটর সাইকেল থেকে নামতে নামতে বলে– কী চমৎকার সময় গেল।

মমতা এগিয়ে আসেন। কিছু বলার আগেই ভদ্রলোক বলেন– একা একা কী করছিলেন।

সমুদ্র দেখছিলাম। আপনাদের সময় ভাল কেটেছে তো?

কী মিমি কেমন কেটেছে সময়?

চমৎকার!

একটু রেস্ট নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়া যাবে। ওরা কেবল বড় বুদ্ধ মূর্তিটা দেখে ফিরে এসেছে। অয়ন কাজল বলেন– এখানে আরো অনেক কিছু আছে। আমার বাবা একটা লিস্টি বানিয়ে দিয়েছেন। এই বলে পকেট থেকে বাবার হাতে লেখা লিস্টিটা বের করে। মিমি আর মমতা ঝুঁকে পড়ে লিস্টির উপরে। মমতা বিচের খাবার খেয়েছে। ওরা চা আর ডিম। এই অসাধারণ সৌন্দর্যের ভেতর খাওয়া নিয়ে কেউ এখনো কিছু ভাবছে না। চারিদিকে কোলাহল। নৌকা এখানে-সেখানে। কিছু কিছু নারকেল গাছ ঝুঁকে আছে সমুদ্রে। ছায়া পড়েছে। দিনটা সুন্দর। আগামীকাল পূর্ণিমা। এখন সূর্য অকৃপণ।

বলে অয়ন কাজল– আজ আমরা লেবুর চরে যাইনি। কাল যেতে হবে। ওখান থেকে সূর্যোদয় খুব ভাল দেখা যায়। আর সন্ধ্যায় কাউয়ার চরে– সেখান থেকে সূর্যাস্ত। অসুবিধা নেই, আমি তো এই মোটর সাইকেলটা একেবারে ভাড়া করে নিয়েছি। দুই চরেই বন আছে। এ ছাড়া ১৫/২০ কিলোমিটার ড্রাইভটাই তো অসাধারণ। আর সুন্দরবনের সৌন্দর্য দেখতে আমরা ফাতরার চরে যেতে পারি। সেখানে ঝাউবন। লেক। পাখি আর প্রজাপতি। না দেখলে বোঝানো যাবে না। দু'দিন আগে এসে আমি একটু এক্সপ্লোর করেছি, তাই মোটামুটি অনেক কিছু জেনে ফেলেছি। আর বুদ্ধদেবের মন্দির। তোমাকে যেখানে নিয়ে গিয়েছিলাম মিমি সেটাই সবচেয়ে বড় বুদ্ধ মন্দির। এই বুদ্ধমূর্তি সাউথ এশিয়ার ভেতরে সবচেয়ে বড় বুদ্ধ মূর্তি।

ওরা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। কথা শুনে মনে হয় যে কোন গাইডের চেয়ে বড় গাইড এই অয়ন কাজল।

এ ছাড়া আরো কিছু আছে?

লেবুর চরের ভেতরে জলবিহার নৌকায়। ফাতরার চরে গেলে মনে হবে আমরা সুন্দরবনে। আর আছে জেলেপল্লি। শুটকি ও তাজা মাছের জন্য অনেকেই ওখানে যায়। আর আছে নারকেল আর ডাব। কথা বলতে না বলতেই ডাবওয়ালা তিনটে ডাবে স্ট্র বসিয়ে ওদের দিয়ে যায়।

মমতা বলে– অয়ন কাজল আমি বলছি কী আজ আর কোথাও যাবার দরকার নেই। কাল তিনজন একসঙ্গে বেরিয়ে পড়া যাবে। দেখতে পাচ্ছেন

মন্দির দেখে, পাশাপাশি বসেও মমতা প্রশ্ন করতে পারেন না অয়ন কাজল কী বিবাহিত না অবিবাহিত, ডিভোর্সি না সেপারেটেড। দরকার কী এইসব প্রশ্নের। গানের রেশ, চলার রেশ, গতির রেশ, সাগরের পাশ দিয়ে চলার আনন্দ। এইসব থাক। বলেন তিনি– কী ভাগ্য আমাদের অয়ন কাজল আপনার মত এমন একজনকে পেয়ে গেলাম আমরা।

কেউ আমরা তেমন ওজনদার নই। অনায়াসে তিনজন মোটর বাইকে উঠতে পারি। চারপাশে তাকিয়ে মিমি বলে– তাইতো ওরা তো তিনজন তিনজন করে ঘুরছে। মানে মোটর সাইকেলওয়ালা বাদে আরো দুইজন।

কিন্তু তার আগে আপনার যেটা ডিউ সেটা করতে হবে। উঠুন মমতা। এখন তুমি বসে থাকো মিমি। ফিরে এসে আমরা লেবুরচরে বার্বিকিউ ভোজনে যাব। মাছ বার্বিকিউ।

মোটর সাইকেল যেই না চলতে শুরু করেছে একটা পুরনো হিন্দিগানের সুরে চমকে ওঠেন মমতা। 'ইয়ে রাত ইয়ে চাঁদনি' অয়ন কাজলের কাছে শুনবেন ভাবেননি।

এইসব গান?

মায়ের জমানো সি ডি। ভালকথা আমার মা গানপাগল ছিলেন। যেটা আমি পেয়েছি। ওঁর সিডি থেকে শেখা এইসব গান। বিদেশে খুব ডাক পড়ে এইসব গাইবার জন্য। এরপর অয়ন কাজল গান ভাললাগা, শেখা, সংগ্রহের কথা বলে।

অপূর্ব এই চলা। মমতা কোমরে ওড়না ভাল করে জড়িয়ে নিয়েছেন। মিমির মত টি সার্ট আর জিনস নয়। তাঁর বড় খোঁপার বেণীতে বড় ক্লিপ। যেন অনেকদিন পর কোন এক অভূতপূর্ব সময় ঝিনুকের মুক্তোর মত নিজেকে মেলে দিয়েছে। মন্দির দেখে, পাশাপাশি বসেও মমতা প্রশ্ন করতে পারেন না অয়ন কাজল কী বিবাহিত না অবিবাহিত, ডিভোর্সি না সেপারেটেড। দরকার কী এইসব প্রশ্নের। গানের রেশ, চলার রেশ, গতির রেশ, সাগরের পাশ দিয়ে চলার আনন্দ। এইসব থাক। বলেন তিনি– কী ভাগ্য আমাদের অয়ন কাজল আপনার মত এমন একজনকে পেয়ে গেলাম আমরা। একটু বসে ওর গান নিয়েই কথা হল। অয়ন কাজল কেবল ওর মায়ের কথা বলছিল। আর মমতা ওর নিজের কথা। কত বয়স হবে মমতার মনে মনে ভেবেছিল।

তারপর? যেন অনির্বাণ পাখির পালক থেকে ঝরে পড়ল কয়েকটা দিন। সোনার জলে ধোওয়া। আনন্দ, আনন্দ। অয়ন কাজল বলে– বাবার দেওয়া নাম অয়ন মায়ের দেওয়া কাজল। একটা নাম বেছে নিয়ে ডাকতে হবে। তিনজন অয়নের মোটর বাইকে ঘুরে বেড়ালো নানা জায়গা। ফাতরা দ্বীপে এসে এর রূপে মুগ্ধ হল তিনজন। বারবার মুগ্ধতা ওদের ছেয়ে ফেলল।

ঘরের ভেতরের ছোট পার্টিতে অয়নের গিটার সুর তুলল সেই পুরনো গানের– নাহি চাঁদ হোতা/ না তারে রাহেঙ্গে। তারপর কানকাটা ভ্যান গফের গান – স্টারি স্টারি নাইট। একটা হুল্লোড়ে গান কোনমতে গেয়ে ফেলল মিমি। অয়নের গিটারে। মিমির গলা ভাল। আর মমতা জীবনানন্দের 'আবার আসিব ফিরে।'

লেবুর চরের বার্বিকিউতে মাছের স্বাদ উপভোগ করতে করতে বলল অয়ন এইসব দিনগুলো ভোলা যাবে না।

আমিও না। মিমি চড়ুইপাখির মত কিচ কিচ করে বলে। –ভুলবার দরকার কী? বলল মমতা।

বিচের ছল ছল স্রোতে উপুড় হয়ে থাকা নৌকা আর সবুজ নারকেল গাছের দিকে তাকিয়ে অয়ন বলে– মায়ের বড় ভয় ছিল হয়তো একদিন আমি বিদেশি হয়ে যাব। এখন যদি মা আমাকে দেখেন বড় খুশি হবেন। আমি বিদেশি হয়ে যাইনি মা। এখন তুমি আমাকে দেখ।

মমতা ছলছল চোখে বলে– মা কোথায়?

মা নেই। একগাদা বাংলা বই আর একগাদা ক্যাসেট, সিডি, গানের বই রেখে গেছেন আমার জন্য। আমি মায়ের যেমন পছন্দ তেমন হয়ে উঠবার চেষ্টা করেছি।

– আপনি সাকসেসফুল। বলে মিমি।

রাতে মিমি নিজের খাটে শুয়ে আঁধারে বলে মাকে– মা জাভেদ আমার ব্যাপারে বড় সিরিয়াস।

কী বলেছে ও? মা জাভেদকে জানেন। ওরা দু'জন একসঙ্গে পড়াশুনো শেষ করেছে।

একসঙ্গে বিদেশে যাব। তার আগে...। মিমি শেষ করে না।

বুঝলাম। মমতা বলেন। তোর যদি কোন আপত্তি না থাকে আমার নেই। জাভেদ চমৎকার ছেলে। অন্য বিছানা থেকে বোধহয় অন্ধকারে কতগুলো শব্দ ছুঁড়ে দেয় মমতা। –আমি বলিনি। আসবার আগের দিন পেলাম। তোর বাবা লিখেছেন– মমতা তুমি কী আমাকে ক্ষমা করতে পারবে? আমি একটা মস্ত বড় ট্রান্সের ভেতর ছিলাম।

মা! তুমি বলনি তো?

বলিনি। কারণ এখনো বুঝতে পারছি না কী জবাব দেব।

মা। বাবাকে ক্ষমা করে দাও।

মমতা পাশ ফিরতে ফিরতে বলে– একটু ভাবতে দে রে মিমি। সকালে যাত্রা। একটু ঘুমিয়ে নিলে হয় না!

নিজের ঘরে বাবার সঙ্গে কথা বলছে অয়ন। –বাবা কেমন আছ?

ভাল। তুই কেমন রে অয়ন?

খুব ভাল বাবা। বাবা পারিজাত নামে যে মেয়েটাকে কায়দা করে দেখিয়েছিলে তখন কিছু বলতে পারিনি। এখন বলছি ওকে পছন্দ হয়েছে।

আলহামদোলিল্লাহ অয়ন। সাত বছর একটা বিদেশি মেয়েকে নিয়ে ঘর করলি। মেয়েটা বুকে চাকু চালিয়ে চলে গেল। এখন আমার পারিজাতকে পছন্দ কর। বন্ধু রাশেদের মেয়ে। দৃপ্ত, সহজ, সুন্দর, অনাবিল। বাবা একসময় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়াতেন।

ঠিক আছে বাবা।

কী করে হঠাৎ মত বদলে গেল তোর? আহা তোর মা থাকলে...। বলছিলি বড় হয়েছিস ওদেশে। বাংলাদেশী মেয়ে কী তোর সঙ্গে নিজের জীবন মেলাতে পারবে। তোর মত সহজ হবে?

ঠিক আছে বাবা এই তো আর দুইদিন পর আসছি। জানো তো বাবা আমার মনে হয়েছিল বাংলাদেশের মেয়েদের 'সেন্স অফ হিউমার' নেই। সব ব্যাপারে খুব সিরিয়াস।

বাবা হাসেন। হঠাৎ কেমন করে মনে হল– পারিজাতের আছে? তোকে বলছি পারিজাত রামগরুড়ের ছানা নয়। তবে পড়াশুনার ব্যাপারে ডেড সিরিয়াস। ঠিক তুই যেমন।

বাবা ফোন রাখেন।

এই পাঁচদিন দুটো প্রাণ তাকে যেভাবে সঙ্গ দিল তাতে অয়ন বুঝতে পেরেছে অনেক কিছু। কোন জন বেশি মনের মত? একজন গভীর নদী আর একজন ঝর্না। একজন মাতাল হাওয়া আর একজন সুমন্দ বাতাস। মনে মনে বলে অয়ন– পারিজাত ওদের দু'জনের একজনের মত হলেই হবে। আর যদি না হয়? তখন দেখা যাবে।

সালেহা চৌধুরী
লন্ডনপ্রবাসী কথাসাহিত্যিক

Coca-Cola

খোলো খুশির জোয়ার!

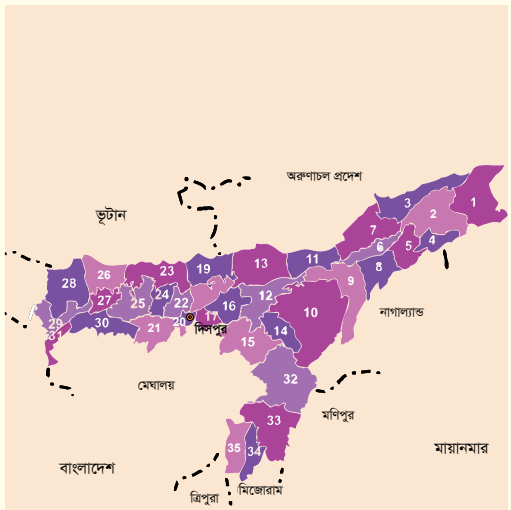

এক নজরে আসাম

দেশ	ভারত
অঞ্চল	পূর্ব ভারত
রাজধানী	দিসপুর
বৃহত্তম শহর	গুয়াহাটি
জেলা	৩৫টি
প্রতিষ্ঠা	২৯ জানুয়ারি ১৯৫০
সরকার	
• শাসকবর্গ	আসাম সরকার
• রাজ্যপাল	বানওয়ারিলাল পুরোহিত
• মুখ্যমন্ত্রী	সর্বানন্দ সনোয়াল (বিজেপি)
• আইনসভা	এককক্ষযুক্ত (১২৬টি আসন)
• হাইকোর্ট	গৌহাটি হাইকোর্ট
আয়তন	
• মোট	৭৮,৪৩৮ কিমি (৩০,২৮৫ বর্গমাইল)
• এলাকার ক্রম	সপ্তদশ
জনসংখ্যা (২০১১)	
• মোট	৩১,২০৫,৫৭৬
• ক্রম	১৫
• ঘনত্ব	৪০০/বর্গকিমি (১০০০/বর্গমাইল)
সময় অঞ্চল	ভারতীয় প্রমাণ সময় (ইউটিসি+০৫:৩০)
আইএসও ৩১৬৬ কোড	IN-AS
সরকারি ভাষা	অসমিয়া, ইংরেজি ও অন্যান্য
ওয়েবসাইট	assam.gov.in

বনোয়ারিলাল পুরোহিত

সর্বানন্দ সনোয়াল

রাজ্য পরিচিতি

আসাম

উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম বা অসম রাজ্যটি হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত এবং এর ভেতরে রয়েছে ব্রহ্মপুত্র নদ, বরাক উপত্যকা এবং উত্তর কাছাড় পর্বতমালা। উত্তর-পূর্ব ভারতের আরও ছয়টি রাজ্য, যথা অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা এবং মেঘালয় দ্বারা আসাম পরিবেষ্টিত এবং আসামসহ প্রতিটি রাজ্যই উত্তরবঙ্গের একটি সংকীর্ণ অংশ দ্বারা ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত। এছাড়াও আসামের আন্তর্জাতিক সীমানা রয়েছে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভূটান এবং বাংলাদেশের সঙ্গে।

১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে ইয়ান্দাবু চুক্তির মাধ্যমে আসাম প্রথম ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই রাজ্য মূলত চা, রেশম, পেট্রোলিয়াম এবং জীববৈচিত্রের জন্য বিখ্যাত। আসাম সাফল্যের সঙ্গে একশৃঙ্গ গণ্ডার সংরক্ষণ করে তাদের অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছে। এছাড়াও এখানে বাঘ, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি সংরক্ষিত হচ্ছে। এশীয় হাতির অন্যতম বাসস্থান হল আসাম। এই রাজ্যটি বন্যপ্রাণী পর্যটনের ক্ষেত্রে ক্রমেই একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হয়ে উঠছে।

ইতিহাস

মহাভারতে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর হিসাবে আসামের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়াও

অহম রাজপ্রাসাদ

ইতিহাসের সাক্ষী তেজপুরের কনকলতা উদ্যান

খ্রিস্টীয় প্রথম সহস্রাব্দে কামরূপ নামে এই অঞ্চলের পরিচিতি ছিল। এই অঞ্চলে অহম সাম্রাজ্য (১২২৮-১৮২৬) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে এই রাজ্য 'আসাম' নামে পরিচিত হয়।

আসাম এবং এর আশপাশের এলাকগুলোতে প্রস্তর যুগ থেকেই মানুষের বসবাসের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রন্থ কালিকাপুরাণ (খ্রি. নবম-দশম শতাব্দী) মতে, আসামের প্রথম শাসক ছিলেন দানব রাজবংশের মহীরঙ্গ দানব। এটি মিথিলার নরক রাজবংশের শাখা। এই শাসকদের সর্বশেষ শাসকের নাম নরক, শ্রীকৃষ্ণ যাকে বধ করেছিলেন। নরকের ছেলে ভগদত্ত রাজা হয়ে কিরাত, চিনা ও পূর্ব-উপকূলের বাসিন্দাদের নিয়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরবদের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন।

চতুর্থ শতকে সমুদ্র গুপ্তের এলাহাবাদ শিলালিপিতে কামরূপ (পশ্চিম আসাম) ও দেবক (মধ্য আসাম)-কে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী রাজ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দেবক পরে কামরূপকে একীভূত করে বর্তমান নদীয়ার নিকটবর্তী করতোয়া ও উত্তরবঙ্গ, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, বাংলাদেশের কিয়দংশ, পূর্ণিয়া এবং পশ্চিমবঙ্গের অংশবিশেষ নিয়ে একটি বৃহৎ রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

বর্তমান গৌহাটি (প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর), তেজপুর (হরুপেশ্বর) এবং উত্তর গৌহাটি(দুর্জয়)-কে রাজধানী করে যথাক্রমে বর্মণ রাজবংশ (খ্রি. ৩৫০-৬০০), ম্লেচ্ছ রাজবংশ (খ্রি. ৬৫৫-৯০০), কামরূপ-পাল রাজবংশ শাসন করেন। এরা সবাই নিজেদের নরকাসুরের উত্তরসূরী বলে দাবি করতেন। নরকাসুর এসেছিলেন আর্যাবর্ত থেকে। বর্মণ রাজা ভাস্কর বর্মণের সময় চিনা পরিব্রাজক ইউয়েন সাঙ এখানে এসেছিলেন। পরে চন্দ্র রাজবংশ (খ্রি. ১১২০-১২৫০) কামরূপ শাসন করে।

এর পরের তিন রাজবংশ হচ্ছে অহম, মুতিয়া ও কোচ। অহম রাজবংশ উত্তর আসামে প্রায় ছ'শো বছর (খ্রি. ১২২৪-১৮২৬) শাসন করেন। মুতিয়া রাজারা (খ্রি. ১১৮৭-১৬৭৩) ব্রহ্মপুত্রের উত্তরভাগ থেকে পশ্চিমে বিশ্বনাথ এবং উত্তর আসামের পূর্ববর্তী পরশুরাম কুণ্ড থেকে অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত শাসন করেন। তিব্বতী-বার্মিজ কোচ রাজা নরনারায়ণের (খ্রি. ১৫৪০-১৫৮৭) শাসনামলে পশ্চিম আসাম থেকে বর্তমান উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত কোচরাজ্য বিস্তৃত ছিল। সপ্তদশ বা অষ্টদশ শতাব্দীতে অহমরা করতোয়া নদী পর্যন্ত তাদের রাজত্ব বিস্তৃত করেন।

অন্যান্য রাজবংশের মধ্যে কাছাড়িরা (ত্রয়োদশ-১৮৫৪ খ্রি.) দিখোউ নদী থেকে মধ্য ও দক্ষিণ আসাম পর্যন্ত তাদের রাজ্যের বিস্তার ঘটান। এদের রাজধানী ছিল ডিমাপুর। পূর্ব আসামের আধিপত্য নিয়ে মুতিয়া ও অসম রাজাদের মধ্যে তীব্র বিরোধ ছিল এবং তারা অনেকবার যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ইংরেজদের আগমনের আগে পর্যন্ত মুসলমানসহ কোন বিদেশী শক্তিই আসাম দখল করতে পারেনি। আওরঙ্গজেবের গভর্নর মীর জুমলা তৎকালীন রাজধানী গড়গাও বছরখানেকের জন্য (খ্রি. ১৬৬২-১৬৬৩) দখল করেছিলেন বটে, কিন্তু চোরাগোপ্তা হামলায় বিপর্যস্ত হয়ে তিনি পিছু হটতে বাধ্য হন।

১৯৩৪ খ্রি. আসামে *Camellia Sinensis* আবিষ্কৃত এবং ১৯৩৬-৩৭ খ্রি. লন্ডনে পরীক্ষিত হবার পর ব্রিটিশরা ১৮৩৯ সাল থেকে বিভিন্ন কোম্পানির কাছে জমি লিজ দিতে শুরু করে। তারপর পূর্ব-আসামে ব্যাঙের ছাতার মত একের পর এক চা-বাগান গযে উঠতে থাকে। তখন চিন থেকে শ্রমিক আনা হত। স্থানীয় অসমীয়দের বাধার মুখে মধ্য ও পূর্ব ভারতের শ্রমিকদের বাগানের কাজে লাগানো হয়। চিনা এবং চিনা-অসমীয় উচ্চফলনশীল নানা জাতের চা গাছ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর *Camellia assamica*-কে আসাদের জন্য সবচেয়ে উপযোগী বলে নির্বাচিত করা হয়। ১৮৫০ সালে চা-শিল্প কিছু লাভের মুখ দেখে। ১৮৬১ সালের দিকে বিনিয়োগকারীদের আসামে জমি কেনার অনুমতি দেওয়া হয় এবং ১৮৭০-এর দশকে নতুন প্রযুক্তি ও মেশিনারি আবিষ্কারের পর চা-শিল্প বিকাশ লাভ করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মোয়ামোরিয়া বিদ্রোহে জনগণের জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হয়। বিদ্রোহ কিছুটা থামলে শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। প্রধানমন্ত্রী পূর্ণানন্দ বুরহাগোহাইন ও পশ্চিম-আসামের অহম ভাইসরয় বদনচন্দ্র বরফুকনের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধের সুযোগে বার্মিজরা আসাম দখল করে নেয়। ফলে অসমীয়রা ব্রিটিশশাসিত বাংলায় পালিয়ে আসতে

ব্রহ্মপুত্রের ওপর কোলিয়া ভোমরা সেতু

শিবসাগরের টালাটল ঘর কামান

বাধ্য হয়। বার্মিজরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সীমান্ত পর্যন্ত চলে এলে ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ব্রিটিশ-বার্মিজ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বার্মিজরা সন্ধি করতে বাধ্য হয়। ১৮২৬ খ্রি. ইয়ান্দাবু চুক্তি অনুযায়ী কোম্পানি পশ্চিম আসামের নিয়ন্ত্রণ লাভ করে এবং ১৮৩৩ সালে পুরন্দর সিংহকে আপার আসামের রাজা নিয়োগ করে। পরে ব্রিটিশরা গোটা এলাকায় তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

প্রথমদিকে আসাম ছিল বেঙ্গল রেসিডেন্সির অংশ। পরে ১৯০৬ সালে এটি হয় পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের অংশ। ১৯১২ সালে এটি আসাম প্রদেশ হিসেবে পুনর্গঠিত হয়। ১৯১৩ সালে তৎকালীন শিলংয়ে একটি লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ও ১৯৩৭ সালে আসামে একটি লেজিসলেটিভ এসেম্বলি গঠিত হয়। ব্রিটিশ চা কোম্পানিগুলো মধ্য ভারত থেকে শ্রমিক এনে আসামের জনমিতি ক্যানভাসকে বড় করে তোলে।

১৮৫০-এর দশকে আসামের স্বাধীনতা আন্দোলন কয়েকবার ব্যর্থ হয়। তবে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অসমীয়রা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে সমর্থন দেয়। এসময় গোপীনাথ বরদলুই জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। মাওলানা ভাসানীর সমর্থনপুষ্ট মুসলিম লিগের স্যার সাইদুল্লাহ ছিলেন তাঁর প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর আসাম ভারতের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। আসামের সিলেট জেলা (করিমগঞ্জ মহকুমা ছাড়া) তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানকে (বর্তমান বাংলাদেশ) দিয়ে দেওয়া হয়।

ভারত সরকার স্থানীয় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে আসামকে কয়েকটি রাজ্যে বিভক্ত করেন। ১৯৬৩ সালে নাগা পার্বত্য জেলা 'নাগাল্যান্ড' নামে ভারতের ১৬তম রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৭০ মেঘালয় মালভূমির উপজাতীয় মানুষের দাবি মেটাতে খাসি, জৈন্তিয়া ও গারো পাহাড় নিয়ে আসামে একটি স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল গঠিত হয়; ১৯৭২ সালে এটি 'মেঘালয়' নামে স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। ১৯৭২ সালে আসাম থেকে অরুণাচল প্রদেশ (উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সি) ও মিজোরাম (দক্ষিণের মিজো পাহাড় থেকে) কেন্দ্রীয় ভূখণ্ড হিসেবে আলাদা হয়; উভয়েই ১৯৮৬ সালে রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে।

স্বাধীনতার পর আসামে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার কারণে স্বায়ত্বশাসন ও সার্বভৌমত্বের দাবি ওঠে, ফলে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই আসামসহ পুরো উত্তর-পূর্ব ভারতে অর্থনৈতিক সমস্যা প্রকট হতে শুরু করে। যার ফলে ওই অঞ্চলে সার্বভৌমত্বের দাবিতে বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই আসামে পূর্ব পাকিস্তান থেকে শরণার্থীরা আসতে শুরু করে। ১৯৬১ সালে মুখ্যমন্ত্রী বিমলাপ্রসাদ চালিহার নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার বিধানসভায় একটি বিল পাশ করে, যার মাধ্যমে অসমীয়াকে রাজ্যের একমাত্র সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এর প্রতিবাদে দক্ষিণ আসামের কাছাড় জেলার বাঙালিরা ভাষা আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৬১ সালের ১৯ মে ভাষা আন্দোলন চলাকালীন আধা-সামরিক বাহিনির গুলিতে এগারোজন আন্দোলনকারীর মৃত্যু হয়। এরপর চাপের মুখে সরকার ভাষা বিলটি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

১৯৮০-র দশকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ৬ বছর ধরে অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলে, যা আসাম বিক্ষোভ নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৭০-এর দশকে আসামে ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ অসম (উলফা) এবং ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট অফ বোড়োল্যান্ড (এনডিএফবি)-এর মত সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর জন্ম হয়। ১৯৯০-এর নভেম্বরে ভারত সরকার সেখানে সেনা মোতায়েনে বাধ্য হন। সাম্প্রতিককালে জাতিগত বিরোধ নিরসনে ভারতীয় সংবিধানের ৬ষ্ঠ তপসিল ও স্বায়ত্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকা অনুযায়ী বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল এলাকায় বোড়ো-কাছাড়ি সম্প্রদায়, কারবি অংলংয়ে কারবি এবং ডিমা হাসাও জেলার মানুষের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন নিশ্চিত করা হয়েছে। আসামের বাকি অংশে পঞ্চায়েতী রাজ চালু রয়েছে।

ভারতের ৬টি ভূ-প্রাকৃতিক বিভাজনের ৩টিই আসামে বিদ্যমান। এগুলি হল উত্তরাঞ্চলীয় হিমালয় (পূর্বাঞ্চলীয় পর্বতমালা), উত্তরাঞ্চলীয়

চড়ুইদেওর রাজকীয় উদ্যান

জোড়হাটের সি কে হান্ডিক ভবন

সমভূমি (ব্রহ্মপ্রত্র সমভূমি) এং দাক্ষিণাত্য মালভূমি (কারবি অংলং)। আসামে ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত হওয়ার এখনকার জলবায়ু শীতল ও বৃষ্টিবহুল। আসামের প্রাণপ্রবাহী ব্রহ্মপুত্র প্রাচীন নদী– হিমালয়ের চেয়েও পুরনো। এটি অরুণাচল প্রদেশ হয়ে আসামে প্রবেশ করে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা নামে বিস্তৃত প্লাবণভূমির সৃষ্টি করেছে। কারবি অংলং পর্বতমালা, উত্তর কাছাড় ও গৌহাটির নিকটবর্তী অঞ্চল (কাসি-গারো পর্বতমালাসহ) এখন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে এবং দক্ষিণ ভারতীয় মালভূমি ব্যবস্থায় বিভক্ত হয়েছে। দক্ষিণে বড়াইল রেঞ্জ (আসাম-নাগাল্যান্ড সীমান্ত)-এ উৎপন্ন হয়ে বরাক কাছাড় জেলা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে সুরমা নামে পরিচিতি লাভ করে।

গৌহাটি বিশ্বের ১০০টি দ্রুত বর্ধনশীল নগরীর অন্যতম। গৌহাটি উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার। শিলচর আসামের দ্বিতীয় জনবহুল শহর এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়, শিক্ষা ও পর্যটন কেন্দ্র। ডিব্রুগড় প্রাকৃতিক গ্যাস, চা ও পর্যটনের জন্য বিখ্যাত।

ক্রান্তীয় মৌসুমি চিরহরিৎ জলবায়ু নিয়ে আসাম নাতিশীতোষ্ণ (গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ ৯৫°-১০০° ফারেনহাইট বা ৩৫°-৩৮° সেলসিয়াস ও শীতকালে সর্বনিম্ন ৪৩°-৪৮° ফারেনহাইট বা ৬°-৮° সেলসিয়াস), ভারী বৃষ্টিপাত ও অতি আর্দ্রতাপূর্ণ। প্রবল মৌসুমি বৃষ্টিপাতের ফলে গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা হ্রাস পায় এবং শীতকালে বৃদ্ধি পায় ও সকালে কুয়াশা পড়ে। আসামের কৃষি সাধারণত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীল।

ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে ব্রহ্মপুত্র ও অন্যান্য নদীর বন্যায় প্রতিবছর আসামের বিভিন্ন স্থান প্লাবিত হয়। ফলে বাড়িঘর, গবাদিপশু, সেতু, রেল ও সড়ক ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আসাম পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ জীববৈচিত্রপূর্ণ এলাকা। ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য, পর্ণমোচী অরণ্য, নদীতীরবর্তী তৃণভূমি, বাঁশঝাড় এবং অগণিত জলাভূমি নিয়ে এর প্রতিবেশ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এর অনেকগুলি এখন জাতীয় উদ্যান ও সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে।

আসামে দুটি ইউনেসকো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য দর্শনীয় স্থান রয়েছে– একটি ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যান, অপরটি ভূটান সীমান্তবর্তী মানস বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য। কাজিরাঙ্গা দ্রুত বিলীয়মান একসিঙ্গা গন্ডারের জন্য বিখ্যাত। এখানে বনাঞ্চল ও জলভূমিতে সাদা ডানার বুনো হাঁস(ডেওহান) বেঙ্গল ফ্লোরিক্যান, কালো বুকের প্যারোটবিল, লাল মাথার শকুন, পেছন সাদা শকুন, গ্রেটার এ্যাডজুট্যান্ট, জার্ডনের বাবলার, লম্বা ঠোঁটের হর্নবিল, বাঘ, এশীয় হাতি, শুকর, গাউর, বুনো মোষ, ভারতীয় শুকরসদৃশ হরিণ, গিবন, সোনালি লেঙ্গুর, টুপিওয়ালা লেঙ্গুর, বড়সিঙ্গা, গঙ্গা নদীর শুশুক, বার্মা স্নেকহেড, গঙ্গা হাঙর, বর্মার অজগর, ব্রাহ্মিণী নদী কচ্ছপ, কালো পুকুরে কচ্ছপ, এশীয় বুনো কচ্ছপ এবং আসাম আচ্ছাদিত কচ্ছপের মত বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির প্রাণি দেখা যায়। আসামের বিপন্ন ঘড়িয়াল ও গোলাপি মাথার হাঁস এখন কদাচিৎ দেখা যায়। কাজিরাঙ্গা ছাড়াও আসামে আরো কয়েকটি জাতীয় উদ্যান রয়েছে। এগুলো হচ্ছে ডিব্রু সাইখোওয়া, নামেরি ও ওরাং জাতীয় উদ্যান।

আসাম অতিশয় অর্কিডসমৃদ্ধ। আসামের রাজ্য ফুল হচ্ছে ফক্সটেইল অর্কিড। সম্প্রতি স্থাপিত কাজিরাঙ্গা জাতীয় অর্কিড ও জীববৈচিত্র্য পার্কে ৫ শতাধিক প্রজাতির ১৩১৪ জাতের অর্কিড পাওয়া যায়।

আসামে পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, চুনাপাথর ও অন্যান্য অপ্রধান খনিজ যেমন, চুম্বকীয় কোয়ার্টজাইট, কাওলিন, সিলিমেনাইট, কাদামাটি ও ফেল্ডস্পার পাওয়া যায়। ১৮৮৯ সালে আবিষ্কৃত সব প্রধান পেট্রোলিয়াম গ্যাস মজুদ আপার আসামে অবস্থিত। আসাম ভূতাত্ত্বিক প্রদেশে ৩৯৯ মিলিয়ন ব্যারেল তেল, ১,১৭৮ বিলিয়ন কিউবিক ফুট গ্যাস ও ৬৭ মিলিয়ন ব্যারেল প্রাকৃতিক তরল গ্যাস রয়েছে বলে ইউএসজিএস জরিপে প্রকাশ।

সরকার ও জনমিতি

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী আসামের জনসংখ্যা ৩ কোটি ১১ লাখ ৬৯ হাজার ২৭২। গত ১০ বছরে প্রবৃদ্ধির হার ১৬.৯০ শতাংশ।

মদন কামদেব
ধ্বংসাবশেষ

শিবসাগরের দেবী দোল

গৌহাটির কামাক্ষ্যা মন্দির

সাক্ষরতার হার ৭৩.১৮ শতাংশ। এর মধ্যে পুরুষের সাক্ষরতার হার ৭৮.৮০ শতাংশ, নারীর ৬৭.২৭ শতাংশ।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার ৬১.৫ শতাংশ হিন্দু, ৩৪.২২ শতাংশ মুসলমান। তপসিলি উপজাতীয় খ্রিস্টানরা সংখ্যালঘু, মাত্র ৩.৭ শতাংশ। আসামে তপসিলি উপজাতি জনসংখ্যা ১৩ শতাংশ, এদের ৪০ শতাংশ আবার বোড়ো। এছাড়া সামান্য জৈন, বৌদ্ধ, সিকিমিজ ও সর্বপ্রাণবাদী (খামতি, ফাকে, আইতন প্রভৃতি সম্প্রদায়ের) মানুষ রয়েছেন। আসামের ৩৫টি জেলার মধ্যে ধুবড়ি, গোয়ালপাড়া, মোরিগাঁও, নগাঁও, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, দারং ও বোঙ্গাইগাঁও জেলা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ।

আসামের প্রধান দেশীয় ও সরকারি ভাষা আসামিজ ও বোড়ো। বরাক উপত্যকার ৩টি জেলায় বাংলা সরকারি ভাষা। বাংলা রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহৎ (২৭.৫ শতাংশ) কথ্য ভাষা। আসামে প্রায় ৭ লাখ মানুষ নেপালি ভাষায় কথা বলে। ৬০ লাখ চা-শ্রমিকের ভাষা হিন্দি উচ্চারণের সাদ্রি, সাঁওতাল, কুরুখ ও মুন্ডারি।

২০১৬-র পরিসংখ্যান অনুযায়ী, আসামে মোট ৩৫টি প্রশাসনিক জেলা রয়েছে। ২০১৫-র ১৫ আগস্টে নবগঠিত ৫টি জেলা হচ্ছে: বিশ্বনাথ (সোনিতপুর ভেঙে), চড়ুইদিও (শিবসাগর থেকে), হোজাই (ন'গাঁও থেকে), দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর (ধুবড়ি থেকে) এবং পশ্চিম কারবি অংলং (কারবি অংলং থেকে)। ২০১৬-র ২৭ জুন মাজুলিকে জেলা ঘোষণা করা হয়। এসব জেলায় আবার ৫৫টি মহকুমা রয়েছে। ২০১৬-র ১৯ মে বিধানসভা নির্বচনে সর্বানন্দ সনোয়ালের নেতৃত্বে বিজেপি জয়লাভ করে এবং আসামে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার গঠন করে।

আসামে সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। শিক্ষার মাধ্যম প্রধানত অসমীয়, ইংরেজি ও বাংলা। নেপালি ভাষাও এখানে গুরুত্বের সঙ্গে শেখানো হয়। গৌহাটিতে অসংখ্য স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। কটন কলেজ অত্যন্ত বিখ্যাত।

অর্থনীতি

প্রাচুর্যের মধ্যেও আসামের অর্থনীতি পিছিয়ে। দেশের ২৫ শতাংশ পেট্রোলিয়াম পণ্য আসাম থেকে এলেও এর প্রবৃদ্ধি ভারতের তুলনায় কম। বেকারি আসামের প্রধান সমস্যা। *রেলওয়ে* বা *অয়েল ইন্ডিয়ায়* আসামের চাকরিপ্রার্থীরা তেমন সুবিধা করতে পারে না। আরো আছে অনুপ্রবেশ সমস্যা। আসামের গড় দেশজ উৎপাদনে কৃষির অবদান সবচেয়ে বেশি। আয়ের দিক থেকে কৃষির অবস্থান তৃতীয়। ৬৯ শতাংশ জনশক্তি কৃষিকাজে নিয়োজিত। 'আসাম চা' আসামের সবচেয়ে বড় অবদান। এছাড়া এ রাজ্যে ধান, সরিষা, পাট, আলু, মিষ্টি আলু, কলা, সুপারি, আখ ও হলুদ উৎপন্ন হয়। বন্যা আসামের কৃষকদের বড় ক্ষতির কারণ। বন্যায় কৃষিক্ষেত্র ও শস্যাদির ব্যাপক ক্ষতি হয়।

প্রতিবেশী বাংলাদেশ, নেপাল ও ভূটানের সঙ্গে যাতায়াতের ব্যবস্থা ভাল হওয়ায় আসাম বড় ব্যবসায় কেন্দ্র। বাংলাদেশের সঙ্গে আসামের সীমান্ত চেকপোস্টগুলো হচ্ছে সুতারকান্দি (করিমগঞ্জ), ধুবড়ি, মানকাচর (ধুবড়ি) ও গোলোকগঞ্জ। বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যবসার সুবিধার জন্য সুতারকান্দি ও মানকাচরে বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় চিনের সীমান্তবর্তী লেডো ও নেপাল-ভূটানের সীমান্তবর্তী দারাংয়ে আরও দুটি ব্যবসায় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা রয়েছে। আসামের শিল্প বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির মধ্যে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস ভিত্তিক শিল্প; স্থানীয়ভাবে সুলভ খনিজভিত্তিক শিল্প; বাগানজাত শস্য, খাদ্য প্রক্রিয়াজাত শিল্প; কৃষি ও উদ্যানজাত পণ্য; ঔষধি পণ্য; জৈব প্রযুক্তি পণ্য, ঔষধশিল্প; রাসায়নিক ও প্লাস্টিকভিত্তিক শিল্প অন্যতম।

আসাম রেল, সড়ক ও বিমানপথে যুক্ত। গৌহাটির লোকপ্রিয় গোপীনাথ বড়দলুই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছিল ২০১২ সালের হিসেবে ভারতের দ্বাদশ ব্যস্ততম বিমানবন্দর।

ভারতের অপরিশোধিত তেলের ১৫ শতাংশ আসে আসাম থেকে। আসামের গ্যাসক্ষেত্র পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম। ১৮৬৭ সালে মকুমের তেলখনি থেকে ড্রিলিং করে তেল উত্তোলন শুরু হয়। পূর্ব আসামেই

ঐতিহ্যবাহী বিহু নাচ

এক সিঙ্গা গন্ডার

অধিকাংশ তেলখনির অবস্থান। আসামে ৪টি তেল শোধনাগার রয়েছে। এছাড়া আসামে সার কারখানা, কাগজ মিল, চিনি কল, সিমেন্ট কারখানা, প্রশাধন কারখানা রয়েছে।

সংস্কৃতি

আসামের সংস্কৃতি মিশ্র প্রকৃতির। বর্মণদের ৩০০ বছর ও সালস্তম্ভ ও পালদের ২০০ বছরের শাসনামলসহ কামরূপ রাজ্যের সংস্কৃতি প্রায় ৭০০ বছরের পুরনো। দ্বাদশ শতাব্দীতে পূর্ব আসামে সুতিয়া রাজবংশ প্রতিষ্ঠার পর প্রায় ৪০০ বছরে সেখানে এক মিশ্র সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অহম রাজবংশ প্রতিষ্ঠার পর পরবর্তী ৬০০ বছরে সাংস্কৃতিক মিশ্রণ ঘটে। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে পশ্চিম আসামে কোচ রাজত্ব এবং দ্বাদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীব্যাপী মধ্য ও দক্ষিণ আসামে কাছাড়ি রাজত্বে ব্যাপক সাংস্কৃতিক মিশ্রণ ঘটে।

শ্রীমন্ত শংকরদেবের নেতৃত্বে বৈষ্ণব আন্দোলন আসামের সংস্কৃতিতে অন্য এক মাত্রা যোগ করে। কোচ ও অহম রাজারা স্থানীয়ভাবে হিন্দুয়ানার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ফলে *নামঘর* ও *সত্র* (বৈষ্ণবদের আখড়া) আসামের দৈনন্দিন জীবনের অংশে পরিণত হয়। এ আন্দোলন ভাষা, সাহিত্য, ফলিত ও ললিতকলায় বিরাট অবদান রাখে।

ব্রিটিশ ও ব্রিটিশ পরবর্তীযুগে নাথান ব্রাউন, ড. মাইল্‌স ব্রোনসনের মত আমেরিকান ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি ও স্থানীয় পণ্ডিত হেমচন্দ্র বড়ুয়ার চেষ্টায় শিবসাগর জেলা (অহম রাজত্বের একদা কেন্দ্রস্থল)-য় অসমীয় ভাষার ব্যাপক সংস্কার সাধিত হয়।

সংস্কৃতির ব্যাপক সম্মিলনে আসামের সংস্কৃতি অতিশয় সমৃদ্ধ। পান-সুপারি, গামোছা, কাঁসার তৈরি হোরাই, ঐতিহ্যবাহী রেশমি মেখেলা চাদর (আসামের মেয়েদের ঐতিহ্যবাহী পরিধেয়) ও গুরুজনদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন, অতিথি সৎকার ও বাঁশসংস্কৃতি আসামের অনন্য বৈশিষ্ট্য। তামুলপান, হোরাই ও গামোছা আসামের সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক।

আসামে বহুমুখী ঐতিহ্যবাহী উৎসব প্রচলিত। এসবের মধ্যে বিহু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আসামের সর্বত্র উদ্‌যাপিত হয়। ইংরেজি বর্ষপঞ্জির এপ্রিল মাসে অসমীয় নতুন বছর উদ্‌যাপিত হয়। গভীর উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত আরেক উৎসব হচ্ছে দুর্গাপূজা। ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহাও মুসলমানদের দুই ধর্মীয় উৎসব।

বিহু হচ্ছে ৩টি প্রধান উৎসবের ধারাবাহিক এবং এক বর্ষচক্রে কৃষকের জীবনের ৩টি উল্লেখযোগ্য ক্ষণ– ধর্মরিপেক্ষ ঋতু আবাহন। *রংগলি* বা *বোহাগ* বিহু বসন্ত-আবাহনের উৎসব। বীজ বপনের ঋতু; *কংগলি* বা *কাটি* বিহু হচ্ছে বন্ধ্যা বিহু যখন মাঠ রিক্ত, শূন্য; আর *ভোগলি* বা *মাঘ* বিহু হচ্ছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন বিহু– ফসল কাটা হয়ে গেছে এবং গোলাভরা শস্য, তখনই তো প্রকৃতিকে ধন্যবাদ জানাতে হয়! রংগলি বিহু গান ও নাচের উৎসব। প্রতিটি বিহুর আগের দিনকে বলে উরুক। রংগলি বিহুর প্রথমদিন হচ্ছে 'গরু বিহু'– এদিন গরু-বাছুরকে নিকটবর্তী পুকুর-নদীনালায় নিয়ে বিশেষ যত্নে সাফ-সুতরো করা হয়।

বৈসাগু বোড়োদের অন্যতম জনপ্রিয় ঋতু-উৎসব। নববর্ষ উদ্‌যাপন। বোড়ো ভাষায় 'বৈস' মানে বছর, 'আগু' মানে শুরু।

বুশুডিমা বা বুশু হচ্ছে ডিমসা জনগণের ফসল কাটার উৎসব। ২৭ জানুয়ারি হচ্ছে বুশুডিমা উৎসবের দিন। ডিমসা জনগণ এদিন খ্রাম (এক ধরনের ঢোল) ও মুরি (লম্বা বাঁশি) বাজিয়ে উৎসবে মেতে ওঠে।

অন্যান্য উৎসবের মধ্যে বড়পেতার *দোল উৎসব*, গৌহাটির *ব্রহ্মপুত্র তট-উৎসব*, কাজিরাঙ্গার *কাজিরাঙ্গা হাতি উৎসব* ও *দেহিং পাতকই উৎসব*, লেখপানি, ডিফুর *কারবি যুব উৎসব*, জটিঙ্গার *জটিঙ্গা উৎসবের* কথা ভোলা যায় না। বাৎসরিক উৎসবের মধ্যে পঞ্চদশ শতকে অহম রাজাদের প্রবর্তিত *জনবিল মেলা* ও গৌহাটির কামাক্ষ্যা মন্দিরের *অম্বুবাচি* মেলা উল্লেখযোগ্য।

ফলিত কলাসমূহের মধ্যে পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রবর্তিত ঐতিহ্যবাহী বৈষ্ণব নৃত্যনাট্যের নাম হচ্ছে *অঙ্কিয়া নাট*। অঙ্কিয়া নাটে দেব-দেবী, দানব ও পশুপাখির বড় বড় মুখোশ ব্যবহৃত হয়। নাটকের মধ্যে সূত্রধর কাহিনি বর্ণনা করতে থাকেন।

বোহাগ বিহুর সময় *বিহু নাচ* ও *হুচোরির* পাশাপাশি উপজাতীয় সংখ্যালঘু যেমন রাজবংশীদের *কুশান নৃত্য*, বোড়োদের *বাগুরুম্ভা* ও *বড়দইচিখ্‌লা নাচ* ছাড়াও *চোমাংকানের* সময় চা-শ্রমিক উপজাতীয়দের *কারবি*, *ঝুমুর* কয়েকটি প্রধান লোকনৃত্য। বৈষ্ণব ঐতিহ্যের ধারক *সত্রিয় নাচ* একটি চিরায়ত নৃত্যকলা। এছাড়াও কয়েকটি প্রাচীন নৃত্যকলা রয়েছে যেমন বড়পেতার *ভোরতাল নৃত্য*, *দেওধোনী নৃত্য*, *ওজপালি*, *বেউলা নাচ*, *কা শাদ ইংলং করদম* ও *নিমসো কেরুং*। *কোহিনুর*, *শংকরদেব আবাহন*, *ভাগ্যদেবী*, *হেঙ্গুল*, *বৃন্দাবন*, *ইতিহাস* প্রভৃতি থিয়েটার গ্রুপের আধুনিক থিয়েটার যেমন ঐতিহ্যবাহী, তেমনি জনপ্রিয়।

দেশজ লোকসংগীত প্রভাবিত আধুনিক গানের শিল্পীদের মধ্যে জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা, বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা, পার্বতীপ্রসাদ বড়ুয়া, ভূপেন হাজারিকা, প্রতিমা বড়ুয়া পান্ডে, অনিমা চৌধুরী, লুইত কনোয়ার রুদ্র বরুয়া, জয়ন্ত হাজারিকা, খগেন মহান্ত, দীপালি বরঠাকুর, গণশিল্পী দিলীপ শর্মা, সুদক্ষিণা শর্মার নাম উল্লেখযোগ্য। নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের মধ্যে জুবীন গর্গ, জিটুল সোনোয়াল, অঙ্গরাগ মহান্ত ও জয় বরুয়ার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। সংস্কৃতি ও সংগীত জগতে বিশেষ অবদানের জন্য আসাম সরকার বিষ্ণুপ্রসাদ রাভার সম্মানে পুরস্কার প্রবর্তন করেছে।

বোড়ো ও ডিমসার মত স্থানীয় ভাষা ছাড়াও অসমীয় ভাষায় অধিকাংশ সাহিত্য রচিত হয়। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, বিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়া, হেম বড়ুয়া, ড. মামণি রয়ছম গোস্বামী, ভবেন্দ্রনাথ সাইকিয়া, বেরতীমোহন দত্তচৌধুরী, মহিমা বোরা, লিল বাহাদুর ছেত্রী, সৈয়দ আবদুল মালিক, সুরেন্দ্রনাথ মেহদী, হীরেন গোহাইন প্রভৃতি লেখক অসমীয় ও অন্যান্য ভাষার সাহিত্যিকে আধুনিক করে তুলেছেন।

গোয়ালপাড়ার আশেপাশে আবিষ্কৃত মৌর্য স্তূপ প্রাচীন চারু ও স্থাপত্যকলার সবচেয়ে পুরনো (খ্রি.পূর্ব ৩০০-১০০) উদাহরণ। গুপ্তযুগের শেষভাগে সারনাথ চিত্রকলার ধারায় নির্মিত তেজপুরে প্রাপ্ত দরজার কাঠামোসহ দপরবটিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক কীর্তির অবশেষ প্রাচীন আসামের শিল্পকর্মের সেরা উদাহরণ। চিত্রকলা আসামের ঐতিহ্য প্রাচীন। ইউয়েন সাঙ (সপ্তম শতাব্দী) জানাচ্ছেন, সম্রাট হর্ষবর্ধনকে দেওয়া কামরূপরাজ

রঙঘর– রাজকীয় ক্রীড়া কমপ্লেক্স

ভাস্কর বর্মণের উপহারসামগ্রীর মধ্যে চিত্রকর্ম, বৈচিত্র্যময় নানা দ্রব্য ছিল যার মধ্যে ছিল কিছু অসমীয় রেশমীবস্ত্র। এছাড়া আসামের কাঁসর তৈজসপত্র, বেশমি ও সুতিবস্ত্র বুনন, মুখোশ, মৃৎশিল্প, টেরাকোটা, দারুশিল্প, অলংকারশিল্পের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে।

দৈনিক আসাম, *দৈনিক জন্মভূমি*, *আমার অসম*, *দৈনিক অগ্রদূত*, *অসমীয়া প্রতিদিন*, *অসমীয়া খবর*, *জনসাধারণ*, *নিয়োমিয় বার্তা*, *গণঅধিকার ও শংকর জাতি* আসামের দৈনিক মুদ্রিত সংবাদপত্র। দুই সাপ্তাহিকের নাম *অসম বাণী* ও *সদিন*। ইংরেজি সংবাদপত্রের মধ্যে আছে *দ্য আসাম ট্রিবিউন*, *দ্য সেন্টিনেল*, *দ্য টেলিগ্রাফ*, *দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া* ও *ইস্টার্ন ক্রনিকল*। কারবি ভাষার আঞ্চলিক পত্রিকা *ঠেকর*-এর প্রচার সংখ্যা কারবি অংলং জেলার যে কোন দৈনিকের চেয়ে বেশি। বাংলা *দৈনিক যুগসংখ্যার* সংস্করণ গৌহাটি, শিলচর, কলকাতা ও ডিব্রুগড় থেকে বের হয়। বরাক উপত্যকার শিলচর ও করিমগঞ্জ থেকে প্রকাশিত অন্যান্য বাংলা পত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল *দৈনিক সাময়িক প্রসঙ্গ*, *দৈনিক প্রান্তজ্যোতি*, *দৈনিক জনকণ্ঠ* এবং *নববার্তা প্রসঙ্গ*। হিন্দি দৈনিকের মধ্যে আছে *পূর্বাঞ্চল প্রহরী*, *প্রত্যহ খবর* ও *দৈনিক পূর্বোদয়*।

ডিব্রুগড, গৌহাটি, কোকরাঝর, শিলচর ও তেজপুরে অল ইন্ডিয়া রেডিওর সম্প্রচার কেন্দ্র রয়েছে। এসব কেন্দ্র থেকে স্থানীয় সংবাদ ও সঙ্গীত প্রচারিত হয়। গৌহাটিতে একাধিক বৈদ্যুতিন মাধ্যম যেমন *নিউজ লাইভ*, *ডিওয়াই ৩৬৫*, *প্রতিদিন টাইম*, *আসাম টকস্*, *প্রাগ নিউজ ও নিউজ ১৮ আসাম/নর্থ-ইস্ট*-এর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত।

সূত্র ইন্টারনেট

অনুবাদ মানসী চৌধুরী

রান্নাঘর

আসামের রান্না

আসামের প্রচলিত ভোজ অনেক খাদ্যদ্রব্য যেমন ভাত, ডাল, মাছের ঝোল, মাংস বা শাক ও ভাজি-র সমন্বয়ে প্রস্তুত। ভাত আসামের প্রধান খাদ্যদ্রব্য। অনেক ধরনের ভাত অনেকভাবে প্রস্তুত ও খাওয়া হয়।

রুই, ইলিশ ও চিতল মাছের তরকারি খুব জনপ্রিয়। হাঁস ও কবুতরের মাংসের পদ থাকে। তবে যুবসমাজের কাছে শুকর, মুরগি বা খাসির মাংস জনপ্রিয়। আরেকটি পছন্দের খাবার হচ্ছে লুচি-তরকারি। তরকারি আমিষ-নিরামিষ দুইই হতে পারে, সঙ্গে আচার। আসামের ঐতিহ্যবাহী ভোজের দুই প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে খার ও টেঙা। খোরিকা হচ্ছে মাংস সেদ্ধ বা ভুনা– ভাতের সঙ্গে খাওয়া হয়। খোরিকায় শুকর, মুরগি, হাঁস, মাছ, খাসি, গরু (মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে) ও পালা-পার্বণে কবুতর খাওয়া হয়। ফড়িং, রেশম পোকা, কুচে মাছ, বনমোরগ, ও অন্যান্য পাখি, হরিণের মাংসও ভোজন করা হয়।

খোরিস (বাঁশের মূল) তরকারির সুগন্ধ বৃদ্ধির কাজে ব্যবহৃত হয়। এ দিয়ে চাটনিও তৈরি হয়। কলদিল (কলার মোচা) ও স্কোয়াশ সবজি হিসেবে রান্না করা হয়ে থাকে। অনেক বাড়িতে লাউপানি, সাজ, পানীয়, জাউ, জৌমাই, হর প্রভৃতি ঐতিহ্যবাহী পানীয় তৈরি হয়। উৎসবের সময় অতিথিদের এসব পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়।

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

পাসিং শো

অমর মিত্র

বার.

অতীনকে ধরেছে নিলু রায়, এই শোন।

নিলু তেমনি কদমগাছের নিচে বসে আছে প্লাস্টিক চেয়ারে। হাতে খবরের কাগজের ক্রোড়পত্র।

ক্রোড়পত্রে প্রায় বিবসনা মডেল কাম অভিনেত্রীর ছবি। নিলু কাগজটি মুড়িয়ে তাকে আবার ডাকে, আবে, অপিস দেরি হবে না, ওই বিমলটা কেন আসছে তোর বাড়ি?

খুব রাগ হল আচমকা, অতীন বলল, তোর কী?

ধুস শালা, আমি তোর ভালর জন্য বলছি, ও তো ভিখমাঙা পার্টি, ধার করতে এসেছিল?

ছিঃ, তোর কাছে ধার চেয়েছিল? অতীন দাঁড়ায়।

দূর বাঞ্চোত, আমার কাছে ধার চাবে কেন, আমি কি বুড়বক আছি। নিলু রায় হ্যা হ্যা করে হাসে, দিলি তো, আর পাবি না ওর টিকি দেখতে।

অতীন বলল, ও সেই জন্য আসেনি।

পাগলাচোদা, দেখলে পিটাতে ইচ্ছে করে। বলে নিলু রায় পা নাচাতে থাকে, একদিন দেব এমন যে এদিকে আর আসতে সাহস পাবে না।

কেন, ও তোর কী করল?

নিলু বলল, কী করবে, কিছু করার সাহস আছে ওর?

তাহলে পিটাবি কেন? অতীন প্রায় রুখে গেল যেন।

এমনি! বলে পা নাচাতে থাকে নিলু রায়, বলল, দেখলেই ক্যালাতে ইচ্ছে করে।

তুই পারবি, ও তোর হাত ধরলে তো ভেঙে যাবে মুটমুট করে।

আবে, গদাইদা পিটাবে।

কে গদাইদা? অতীন জিজ্ঞেস করল।

থানার হেড কনস্টবল, সে ওর ঘাড়ে হাত দিলে হেগেমুতে একাকার করে দেবে।

তুই কি এখনো থানার সঙ্গে যোগাযোগ রাখিস, ইনফরমারের কাজ করিস?

আরে সে-সব কথা তোকে বলতে যাব কেন?

অবাক লাগল অতীনের। দুবলা হয়ে যাওয়া নিলু রায় এখানে এই কদম গাছের নিচে বসে থাকে কি ওই জন্য? এখনো সে ইনফরমার! হতে পারে নাকি? নাকি পুরনো যোগাযোগ। ভয় দেখাচ্ছে তাকে সেই যোগাযোগের কথা মনে করিয়ে দিয়ে। ইনফরমার হয়ে কতজনকে ভয় দেখিয়ে যে টাকা আদায় করেছে সে। এখন এখানে কদমতলে বসে সেই কাজ করে নাকি? শাদা পোশাকের খোঁচড় যে কত রকমের হয়। এ পাড়ায় একটা পাগলা ছিল সেই তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে। সে ছিল নাকি আসলে পুলিশেরই লোক। মাঝে মাঝে উধাও হয়ে যেত। তখন সকলে ভাবত সে বোধহয় তার পরিবারের কাছে গেছে। সাফ-সুতরো হয়ে ছেলেমেয়ে নিয়ে কাশ্মীর কিংবা রাজস্থান বেড়াতে গেছে কিংবা ঘরে বসে পুজোর গান শুনছে, 'আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুবতারা, আর কতকাল আমি রব দিশাহারা...।'

লোকে এমনি কল্পনা করতে ভালবাসত। তখন ছিল খোঁচড়ের যুগ। নকশাল খুঁজতে খোঁচড়ই ছিল সব। ফলে ভয় দেখিয়ে নিলু কত যে ইনকাম করেছে তখন! এখন পুলিশ নাকি আবার ইনফরমার ছড়িয়ে দিচ্ছে। গেঞ্জি পরা, পাঞ্জাবি পরা পুলিশের ইনফরমার নানা রকম খবর জোগাড় করছে। বায়োডাটা কালেকশন করছে। নাকি আবার একটা কিছু হবে। কী হবে তা বলা যাচ্ছে না। কিন্তু হবে।

চারদিকে ক্ষোভ জমে উঠছে। ছেলেমেয়েরা অদ্ভুত সব কথা বলছে রাতভর নিজেদের ভিতর। এত যুবক-যুবতী একসঙ্গে পরস্পরের সঙ্গে আগে কথা বলেনি। একসঙ্গে রাত জেগে শলা-পরামর্শ করেনি। কিন্তু তাদের কথাগুলো ধরা যাচ্ছে না। একজন লিখেছে, অমুক তুমি বাজে লোক, তোমার মাথায় উকুন হোক। আর একজন লিখেছে, এই লোকটাকে চিনে নাও, ওএলএক্স-এ বেচে দাও।

শম্পার কাছে এইসব শুনেছে অতীন। শম্পা শুনেছে অনির কাছে। ফেসবুকে খুব লেখা হয় অনাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে। কিন্তু গভর্নমেন্ট তা বন্ধ করতে চাইছে সাইবার ক্রাইমের দোহাই দিয়ে। আর ভয় দেখাচ্ছে নকশাল-মাওবাদীর। লেলিয়ে দিচ্ছে পুলিশ। কিন্তু অত রসিক কি সেই সব নকশাল-মাওবাদীরা ছিল? অমন মেধাবী শ্লোগান কবে শুনেছে অতীন? পুলিশ দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে। তাদের যৌবন আরম্ভে যেমন হয়েছিল, তেমন। ভয় হচ্ছে। এমন মেধার সঙ্গে লড়তে না পেরে প্রায় বৃদ্ধ আর ভীতু কেউ তাদের জেলে ঢুকিয়ে দেবে? আবার কি অনেক যুবক-যুবতী জেলে ঢুকবে, মরবে? কেউ কেউ তা করাবে। করাতে গোপনে টাকা ছড়াবে। করালে দেশে শান্তি মিলবে। অতীন আর কথা বাড়াল না, এগোয়। এগোয় বটে, কিন্তু তার ভিতরে একটা কিছু খচখচ করতে থাকে। বিমলে নজর পড়েছে শনি ঠাকুরের। কে যেন বহুদিন আগে ওই বিশেষণে ভূষিত করেছিল নিলু রায়কে। শনি ঠাকুরের মতই যার দিকে দৃষ্টি দেবে নিলু, তার সব্বোনাশ। তারপর তার মনে হল, শনি ঠাকুর যতই বলুক এখন তার চোখে ছানি, ঘোলাটে আলো। ভস্ম করার শক্তি নেই ওই চোখের। শুধু মুখেই মারিতং জগৎ। পথেই দেখা হল সুহাসের সঙ্গে। সে বাজার থেকে ফিরছে, বলল, তুমি এলে না অতীনদা?

কোথায়? অতীন অবাক।

আমাদের বাড়ি, দিদি আবার এসে গতকাল বাঙ্গালুরু গেল।

কবে থাকবে, থাকবে না, তা তো বলওনি। অতীন ঈষৎ বিরক্ত হল।

না মানে, বাবা চলে গেলেন, আমাদের প্রোপার্টি তো ভাগ হবে অতীনদা, দিদি সব করে দিয়ে তবে কানাডা যাবে।

শুরু হয়ে গেল এর মধ্যে?

যা হবে, তার শুরু তো ভাল অতীনদা, দিদির তো অংশ আছে, ভেবেছিলাম দিদি নেবে না, কিন্তু নেবে, ভালই হল। ঈষৎ বিষণ্ণ সুহাস।

সুহাসের মাথায় খোঁচা খোঁচা চুল। মাসখানেকের উপর হয়ে গেছে তার বাবার মৃত্যু। অতীন বলল, রূপা তাহলে অংশ নেবে?

আইনত প্রাপ্য যা তাই তো নেবে।

আচ্ছা। অতীন চুপ করে গেল। সে আর কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। তারপর আচমকাই বলার কথা মনে পড়ে গেল, তোমাদের বাড়ি গ্রামোফোন ছিল না?

আছে তো এখনো, তবে বাজে না।

খারাপ হয়ে গেছে?

বলতে পারো, এখন ওসব অবসোলিট। আর রেকর্ডগুলো?

আছে, দিদি বলল ওএলএক্স-এ দিয়ে দিতে।

বেচে দেবে, সব কি বেচে দিতে হয়?

না, মানে রেখেই-বা কী করব, ধুলো পড়বে তো।

কেন, শুনবে বাজিয়ে। অতীন বলেই টের পায় কথাটা ঠিক হচ্ছে না। সেও কি রেকর্ড বাজায়, তার ঘরেও তো পড়ুটে বুড়োর মত পড়ে আছে এইচএমভি ফিয়েস্তা রেকর্ড প্লেয়ার। এইচএমভি এখন আর এসব বানায় না। কোম্পানি ধুঁকে ধুঁকে চলছে।

সুহাস হাসে অতীনের কথায়, না, গান সব মোবাইলেই শুনি, আমার ষোল জিবি মেমরি কার্ড রয়েছে, কত গান যে আছে তার ভিতরে, যখন খুশি শুনতে পারি।

তবু, রেকর্ড আর মোবাইল কি এক হয়,

অমর মিত্র

অমর মিত্রের জন্ম ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ৩০ আগস্ট অধুনা বাংলাদেশের সাতক্ষীরার নিকটবর্তী ধূলিহর গ্রামে। বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও পারিবারিক আবহে সাহিত্য তাঁর বিচরণক্ষেত্র হয়ে ওঠে। ২০০৬ সালে *ধ্রুবপুত্র* উপন্যাসের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন অমর। এর আগে, *অশ্বচরিত* উপন্যাসের জন্য ২০০১ সালে পান বঙ্কিম পুরস্কার। অন্যান্য পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে, শরৎ পুরস্কার (ভাগলপুর, ২০০৪), সর্বভারতীয় কথা পুরস্কার (১৯৯৮), গজেন্দ্রকুমার মিত্র পুরস্কার (২০১০)। বর্তমানে কলকাতা শহরে বসবাসরত অমর মিত্রের সাহিত্যিক জীবনের সূচনা ১৯৭৪ সালে। প্রথম উপন্যাস *নদীর মানুষ* ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয় অমৃত পত্রিকায়।

হারিয়ে একটি গান *পাসিং শো*-র কেন্দ্রবিন্দু। এই উপন্যাস একটি হারিয়ে যাওয়া গান আর হারিয়ে যাওয়া রেকর্ড নিয়ে। মানুষ তার জীবনে যা হারায় তাই বুঝি ফিরিয়ে আনতে চায় এইভাবে। একটি গান রেকর্ড করে যে গায়ক মুছে গেছেন স্মৃতি থেকে, সেই গান বুঝি ফিরে আসে গভীর রাতে, বাতাসে ভেসে কিংবা স্বপ্নের ভিতরে। আশ্চর্য এই কাহিনি যেন হারিয়ে যাওয়া জীবনেরই অন্বেষণ। আর এক অজ্ঞাতপ্রায় শিল্পীর প্রতিরোধে এই উপন্যাস পেয়েছে অনন্য এক মাত্রা। *পাসিং শো* যেন প্রবহমান জীবনের অফুরন্ত এক প্রদর্শন। *পাসিং শো* কলকাতার বিখ্যাত নাটকের দল *সায়ক* নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করছে নিয়মিত।

সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত অমরের *ধ্রুবপুত্র* খরাপীড়িত প্রাচীন উজ্জয়িনী নগরের কাহিনি– কবি কালিদাসের *মেঘদূত* কাব্যের এক বিপরীত নির্মাণ যেন। দীর্ঘ এই আখ্যান শেষ পর্যন্ত শূদ্র জাতির উত্থান ও কবির প্রত্যাবর্তনে পৌঁছয়। অন্যদিকে বঙ্কিম পুরস্কারপ্রাপ্ত *অশ্বচরিত* তথাগত বুদ্ধের ঘোড়া কন্থক ও তাঁর সারথী ছন্দকের কাহিনি। ভারতীয় প্রতিবেশে জাদু বাস্তবতার ব্যবহার রয়েছে এ উপন্যাসে। অনন্য ক্লাসিকধর্মী এই উপন্যাস দু'টি বাংলা উপন্যাস ধারায় এক আলাদা রীতির জন্ম দিয়েছে।

যাহ্, অতগুলো রেকর্ড, গাদায় চলে যাবে? না, তা নয়, ওরা আবার খদ্দের খুঁজবে ইন্টারনেটে। সে বাজারে গিয়ে বিমলকে খুঁজতে লাগল, নেই। ইদানীং খুব অনিয়মিত। বাজারে মন গেল না বিমলের। নতুন ওঠা ওল বা পটলেও না। মাছের বাজারে জ্যান্ত ট্যাংরা দেখেও না। কোন রকমে ফিরে এল বাজার সেরে।

আচমকা সব ডিলিট হয়ে যেতে পারে, মোবাইল হারালে কী হবে?

আমি লিঙ্ক বাড়ির কম্পিউটারে ভরে রেখেছি অতীনদা। সুহাস বলে।

পুরনো গান আছে তোমার মোবাইলে? অতীন জিজ্ঞেস করে।

কত! তুমি নেবে, একদিন গিয়ে দিয়ে আসব ব্লু টুথ অন করিয়ে।

অতুলানন্দ রায়, এঁর কোন গান আছে?

বলতে পারব না, তোমায় সব দিয়ে আসব, দেখে নিও। বলে সুহাস এগোতে চায়। অনেক সময় তারা ফুটপাথে দাঁড়িয়ে কথা বলছে একটি কদমগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে। আজ শনিবার। সুহাসের ছুটি নেই। অতীনের আড্ডার দিন। অতীন বলল, তোমরা রেকর্ড বেচো না, ক'টাকা পাবে?

টাকার জন্য না, আসলে যা আমরা কেউ নেব না, তা নেটে ওএলএক্স-এর মাধ্যমে বেচে দেব, রেখে কী করব, আর দিদি ভাববে আমি ওগুলো ফোকটে নেব, তখন এক ঝামেলা, আমরা বাড়িও প্রমোটিং-এ দেব।

রেকর্ডগুলো দেখতে পারি?

দিদি আসুক। বলল সুহাস, দিদিই সব ব্যবস্থা করবে বলে এখন ফিরল না, ছ-মাসের ভিসা, সব করে নিয়ে তবে যাবে।

রেকর্ড কি ও আলাদা করে রেখে গেছে?

না, তবে লিস্ট সমেত প্যাক করে রেখে দিয়ে গেছে।

লিস্ট দেখা যাবে?

হ্যাঁ যাবে, তুমি এস একদিন।

অতীন বলল, যদি রেকর্ড আমি নিই, কিনেই নেব।

মাথা নাড়ে সুহাস, না, নিও না, তখন দিদি সন্দেহ করবে, ওএলএক্স-ই ভাল, কোন ঝামেলা নেই।

আচ্ছা। বলে অতীন হাঁটতে লাগল। যাহ্, অতগুলো রেকর্ড, গাদায় চলে যাবে? না, তা নয়, ওরা আবার খদ্দের খুঁজবে ইন্টারনেটে। সে বাজারে গিয়ে বিমলকে খুঁজতে লাগল, নেই। ইদানীং খুব অনিয়মিত। বাজারে মন গেল না বিমলের। নতুন ওঠা ওল বা পটলেও না। মাছের বাজারে জ্যান্ত ট্যাংরা দেখেও না। কোন রকমে ফিরে এল বাজার সেরে। মনে মনে ঠিক করে নিল গোলাম হোসেনের কাছে যাবে ধর্মতলায়। সুহাসের কাছে ঐ রেকর্ড থাকলেও দেবে না। অপরূপা কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিতে এসেছে। সব বেচেবুচে টাকা বুঝে নিয়ে আকাশপথে ফিরে যাবে। তখন ফোন এল ভোপাল থেকে, তার দিদি কুহু ডাকল, কেমন আছিস তোরা।

ভালই তো। বলল অতীন।

রেকর্ড খুঁজে পেলি?

না, ওরা ওএলএক্স-এ বেচে দেবেরে।

ওএলএক্স– সে আবার কী, কারা কী বেচে দেবে?

সুহাসরা, সব রেকর্ড। অতীন বলল।

তখন কুহু আচমকা বলল, হ্যাঁরে ভাই, তোর মনে আছে উৎপলা সেনের কথা?

হ্যাঁ, খুব মিঠে গলা ছিল।

'এত মেঘ এত যে আলো, তার আলোটুকু তোমায় দিলাম, ছায়া থাক আমার কাছে', মনে পড়ে ভাই তোর?

অতীন বলল, হঠাৎ যে উৎপলা সেনের কথা বলছিস?

মনে পড়ে গেলরে ভাই।

ওই জন্য ফোন করলি?

হ্যাঁরে, ভাবলাম তোর মনে আছে কি না দেখি, সিডি কিনে পাঠাবি ভাই। কুহু বলে ওঠে, ওই গান শুনে কতকিছু যে মনে পড়ে যায়, কুহু বলতে বলতে হাঁপাতে থাকে।

হাঁপাচ্ছিস কেনরে দিদি?

ও, আমার হয়, কিছু না। বলে কুহু।

ডাক্তার দেখালি?

হ্যাঁ, ও কিছু না, বলল, জোরে কথা না বলতে। কুহু বলল, আজ খুব উৎপলা সেনের গান শুনতে ইচ্ছে করছেরে।

কম্পিউটারে খোঁজ, পেয়ে যাবি। বলল অতীন, ইউ টিউব।

কুহু চুপ করে থাকে। অতীন উৎপলা সেনের গানটির সুর মনে করতে থাকে। খুঁজে পায় না। এই তো দিদি বলল, ভুলে গেল এর ভিতরেই? কুহু বলল, আমি ওসব বুঝি না, আমি ফোনটাই পারি শুধু।

আচ্ছা আমি দেখি তোকে কি ভাবে দিতে পারি, রেকর্ড নিবি? অতীন জিজ্ঞেস করল।

কুহু বলল, রেকর্ড কী করে বাজাবরে, কত গান ছিল, হারিয়ে গেছে মনে হয় রেকর্ডের সঙ্গে।

অতুলানন্দের মত?

কুহু কিছু বলল না। ফোন কেটে দিল। পরদিন অতীন অফিস থেকে ফেরার পথে নামল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। তখন এই শহরে সন্ধ্যা নেমেছে। বাতাসে ভেসে উঠেছে ১৯৫১ সালের গান, আহা হা হা হা, আহা হা, কেয়সে বুলায়ে, ঠান্ডি হাওয়ায়ে লেহেরা কি আয়ে...। লতা মুঙ্গেশকর তখন নতুন, কুড়ি একুশ, অতীনের তখন জন্ম হয়নি, তার জন্মের আগে যে গান গাওয়া হয়েছিল, তা কানে এসে বাজে। তখন দক্ষিণ থেকে, লেনিন সরণি ধরে বাতাস ছুটে এল, ঠান্ডি হাওয়ায়ে...।

তের.

অতীন জিজ্ঞেস করে, গুলাম হোসেন কে?

সে এক মধ্যবয়সী। গান থামিয়ে দিল। তার বছর চল্লিশ বয়স। প্যান্ট আর শার্ট। মাথায় শাদা ফেজ। গালে পাতলা দাড়ি। বলল, ওই যে শেষের জন, হোসেন চাচা, কেন, আপনার কী চাই?

একটা রেকর্ড। বলে অতীন দেখল লম্বা শো-কেসে বহু পুরনো সব রেকর্ডের কভার। মুক্তি, উদয়ের পথে, অগ্নি পরীক্ষা, শাপমোচন, শিল্পী, বিপাশা, পিয়াসা, বিশ সাল বাদ, কোহিনুর, তাজমহল, নূরজাহান, জুয়েল থিফ, তালাস, সঙ্গম, গাইড..., মন গুনগুন করে ওঠে, আহা কৌন হ্যায় তেরা মুসাফির, যায়েগা কাঁহা..., কী চান বলুন স্যার?

অতুলানন্দের নাম শুনে সে অবাক। মাথা নাড়তে লাগল, নেহি স্যার, শুনা নেহি, বেঙ্গলি সিঙ্গার তো, শুনা নেহি।

বেঙ্গলি সিঙ্গার কে আছে, ওল্ড ডে'জ সিঙ্গার?

হেমন্ত, মান্না, সতীনাথ, উৎপলা...

না না না, এসব তো কমন সিঙ্গার।

আপনি নাম বলুন। বলে সে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। দেখে অতীন অবাক। সিজার, মানে সে-ই কাঁচি সিগারেট। এই সিগারেট এখন আছে? এই সিগারেট দিয়েই ক্লাস এইটে সে প্রথম সিগারেটের স্বাদ নিয়েছিল টালা পার্কে বসে।

নিন স্যার। সে বাড়িয়ে দিল।

এই সিগারেট তুমি কোথায় পেলে?

বাতাসই ধরে রাখে যা ধরে রাখার। বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায়, যা উড়ে যাওয়ার, ভুলে যাওয়ার। এই বাতাস ইদানীং অতীনের কাছে আসছে ঘুরে ঘুরে। মনে কর আমি নেই, বসন্ত এসে গেছে... নিমতলা শ্মশানঘাটে অমূল্যস্যারকে পোড়াতে গিয়ে রাতে গঙ্গার ধারে বসে এই গান প্রথম শুনেছিল সে।

শিয়ালদায় একটা লোক ফেরি করে। বলল সে।

অতীন নিল সিগারেট। আগুন নিয়ে টানতেই গুনগুন শুনতে পায়, কেন জানি না শুধু তোমার কথা মনে পড়ে..., বহুদিন বাদে মৃণাল চক্রবর্তী। সে বলল, আমি ওঁর কাছে খোঁজ করি, কিন্তু তোমার কাছেও থাকতে পারে, সার্চ করতে হবে।

তার নাম আজিজুল। সে থাকে লিন্টন স্ট্রিটে। তার চোখদুটি চকচকে। সে অনেক গানের খবর রাখে। রবিবারে রেকর্ড খুঁজে বেড়ায় কলকাতার বড়লোকের বাড়ি থেকে। এখন নাকি এমন একটা সময় যাচ্ছে, পুরনো শহর হারিয়ে গিয়ে নতুন শহর মুখ দেখাচ্ছে। আর নতুন শহর মানে নো রেকর্ড, নো সিডি। গানের দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে স্যার। ইউ-টিউবে সবাই গান ভরে দিচ্ছে, রেকর্ড, সিডির কদর নেই। আজিজুল তাকে ছাড়তেই চায় না। ওদিকে সেই গোলাম হোসেন বুড়ো তার দিকে জুলজুল চোখে তাকাচ্ছে। আজিজুল বলছে, কলকাতার বড় বড় মকানে গান ছিল, রিকর্ড আর গ্রামোফোন ছিল, মকানের সঙ্গে সে সব হারিয়ে যাচ্ছে।

হ্যাঁ, তো কী করা যাবে?

গ্রামোফোন কুম্পানি ভি উঠে গেল, মুবাইলে সবাই গান শুনে, কী যে হল স্যার। বলতে বলতে আজিজুল তার পিছনে পিছনে আসে। দাঁড়ায় অতীন। এই যে সেই বুড়ো। কানে হিয়ারিং এইড লাগানো। আজিজুল বলল, চাচার কান গেছে স্যার, ভাল শুনতে পায় না, কিন্তু যা শুনে তাতেই অজ্ঞান, বুঝুন, চাচা ভাল করে কথা শুনে না লেকিন গান শুনতে পায় আগের মত, সমঝদার আছে, হাঁ চাচা, ঠিক কি না?

বুড়োর বয়স সত্তরের কাছে। দাড়ি শাদা। কিন্তু শরীর পোক্ত। সবুজ কালোয় চেক লুঙ্গি আর আশমানি রঙের পাঞ্জাবি। মুখে জরদা-পানের গন্ধ, গায়ে আতর। বুড়ো বলল, মিউজিক আউর মিউজিক, আর কী শুনবেন বাবু, আর কী আছে জগতে?

আজিজুল বলল, মকান ভাঙছে আর গান সব ফুরায়ে যাচ্ছে।

হাঁ, সহি বাত। বলল গুলাম হোসেন, কী চাই বাবু, বড়ুয়ার গান না কাননবালার গান, তুফান মেল তুফান মেল, কী দানাদার গলা।

উঁহু। মাথা নাড়ে অতীন, বলল তার কথা। কথা খুব মন দিয়ে শুনল লোকটা। বিড়বিড় করল, অতুলানন্দ রায় হচ্ছে?

ইয়েস। বলল আজিজুল, যেন সে-ই এসেছে গানের খোঁজে। চুপ করে আছে গুলাম হোসেন। কী যেন মনে করতে চাইছে, বলল, কী গান, শুনান দেখি।

আমার তো গলা নেই হোসেন ভাই। বলল অতীন।

শুনান না বাবু, শুনি একটু।

এ কী কাণ্ড, এই ভর সন্ধেবেলায় ওয়েলিংটন স্কোয়ার মোড়ে দাঁড়িয়ে রেকর্ডওয়ালাকে গান শোনাবে সে? তা হয় নাকি? কিন্তু গানের কথা তো বলতে হবে সুরে লাগিয়েই, তবেই না ধুলোর ভিতর থেকে মুখ দেখাবে হারিয়ে যাওয়া অতুলানন্দ। গুনগুন করল অতীন। কী করে সে তুলবে সুর? রাগ ছিল মাড়োয়া..., এই গানে মায়ের চোখে জল দেখেছে সে। এই নদী কোন নদী? মায়ের বাপের বাড়ির নদী? কপোতাক্ষ? মায়ের কি মনে পড়ত তার কথা? চুপ করে শুনছে গুলাম হোসেন। অতীনের মনে হল তার ভিতরে ভর করেছে অতুলানন্দ। সেই সুদর্শন পুরুষ। হারমোনিয়াম বাজিয়ে একদিন কেন অনেকদিন সুর তুলেছিল সে এই গানে, আর এক গানে... তুমি না বলে গিয়াছ চলিয়া নামিছে অন্ধকার। তারপর রেকর্ড নিয়ে এল। সেভেন্টি এইট। দুই পিঠে দুই গান। দিদির তখন কত গল্প সেই লোকটাকে নিয়ে। তখন কলকাতায় ক্রিকেট ছিল, চাঁদু বোরদে, পলি উমরিগড়, বিজয় মঞ্জরেকর, সেলিম দুরানি, সুভাষ গুপ্তে, নরি কন্ট্রাক্টর... ইডেন গার্ডেন ঘেরা ছিল ঝাউয়ে। তাদের পাড়ায় রেডিওর সঙ্গে মাইক ফিট করে ধারা বিবরণী, ক্রিকেট। উমরিগড় বল করতে ছুটেছেন, ব্যাট করছেন পিটার পারফিট। আউট। আআআউউউউট। সব মনে পড়ে গেল। ইন্ডিয়ার প্রথম জেতা এদেশে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। অতুলানন্দ বিকেলে এলেন। দিদি বসে আছে পাশের ঘরে। দিদিকে ঘিরে গোলাপি বলয়। দিদি খবরের কাগজে সাগরিকা না কোন সিনেমার কথা পড়ছে। ঘটি হাতা লম্বা ঝুলের ফ্রক। তার কোমরের ফিতে ঝুল ঝুল। সেই ফ্রকই উঠে গেল কলকাতা থেকে। ক্যানিং, মোল্লাখালি গেলে পাওয়া যাবে চাষি ঘরের কিশোরীদের গায়ে। হাটে বিক্রি হয়। তাদের কোন মেয়ে নেই।

গুলাম হুসেন বলল, গান তো হল, ফির বলিয়ে।

আজিজুল বলল, হাঁ হাঁ বলিয়ে।

আর তো কিছু বলার নেই, এই গান আমার বাবা সুবিনয় বসু লিখেছিলেন, হি ওয়াজ আ পোয়েট।

তিনি কি মিউজিক দিতেন, মানে সুর লাগাতেন? গুলাম হুসেন জিজ্ঞেস করল।

না, তিনি ছিলেন রাইটার্সের ক্লার্ক।

বললেন যে পোয়েট?

হ্যাঁ, গান লিখেওছিলেন, অতুলানন্দ ছিলেন তাঁর কলিগ।

আর কোন গান?

লিখেছিলেন, কিন্তু রেকর্ড হয়েছিল ওই একটা। বলতে বলতে অতীন টের পায় লেলিন সরণি ধরে পশ্চিমের গঙ্গা পেরিয়ে এদিকে আসছে এক বহু পুরনো বাতাস। বাতাসই তো সব। বাতাসই ধরে রাখে যা ধরে রাখার। বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায়, যা উড়ে যাওয়ার, ভুলে যাওয়ার। এই বাতাস ইদানীং অতীনের কাছে আসছে ঘুরে ঘুরে। মনে কর আমি নেই, বসন্ত এসে গেছে... নিমতলা শ্মশানঘাটে অমূল্যস্যারকে পোড়াতে গিয়ে রাতে গঙ্গার ধারে বসে এই গান প্রথম শুনেছিল সে। তখন ছিল ফালগুন মাস। সুমন কল্যাণপুরের নাম জানত না সে। সেই গান গুনগুন করে উঠল মনে। অতীন বলল, আমার বাবার হাতে পাসিং শো সিগারেট পুড়ে যাচ্ছে, পাশের বাড়ির গ্রামোফোনে রেকর্ড বাজছে, গানটি গুনগুন করলে আমি পাসিং শোর গন্ধ পাই, এখন সিগারেট অভ্যাস বলে, গন্ধ আসে না কাছে, কিন্তু সেই পাসিং শো আর গান মিলে গেছে যেন।

পাসিং শো, হায় আল্লা, এই আজিজুল ওই সিগ্রেট আছে?

আজিজুল বলল, খুঁজতে হবে চাচা।

তুই তো কাঁচি সিগ্রেট মারিস, কে দেয়?

লম্বু মন্ডল, শিয়ালদায় ফেরি করে, মসলন্দপুর বাড়ি।

তো লম্বুকে বল।

হাঁ, বলব, লেকিন আমি তো দেখিনি চাচা। আজিজুল বলল, ওর কাছে সিজার, পানামা, উইন্ডসর আছে, আর সব এখন যা মিলে, পাসিং শো তো শুনিনি।

দুইজন। সত্তর আর চল্লিশ। দুইজনে কথা বলছে, অতীন শুনছে। সে এসেছে রেকর্ডের খোঁজে, হচ্ছে সিগারেটের খোঁজ। গুলাম হুসেন বলছে সে দু'বছর আগে ঝাঁসির কিল্লায় দেখেছিল যেন, হাঁ হাঁ, মনে পড়ে যাচ্ছে

বিডিন ইস্টিটের চ্যাটাজ্জি সাব, কত রিকর্ড দিয়ে গেল এমনিতে, বলল, আর বাঁচবেন না, তিনি না থাকলে রিকর্ড সব নষ্ট করে দেবে বেটা আর বেটার বউ, তো এপরিলে দিলেন, মে মাসের শেষে গান চলছিল বিকালে, এই আলো নিবু নিবু ভাব এসেছে, বাজছিল মুজারট, মুনলাইট সুনাটা, কখন তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেছে কেউ জানে না, কাজের একটা লোক ছিল, সে বাবুকে ডাকতে এসে দ্যাখে নেই।

বাবু।

পাসিং শো না গান?

আপনি গান পেতেন সেদিন রানির কিল্লায় থাকলে, হামি তো সিগ্রেট ছেড়ে দিয়েছি বহুত সাল, লেকিন হামি দেখেছিলাম।

কী দেখেছিলেন গুলামভাই?

আরে সেই যে হ্যাট পরা সায়েব, ইয়া লম্বা, ভাঙা গাল, চোখ ধকধক করছে, তাকে, সাচ বলছি সাব, সেই সায়েব কিল্লা দেখছিল।

কী বলতে কী বলছে গুলাম হোসেন? সিগারেটের প্যাকেটে যে কাউ বয় টুপি পরা টেক্সাসের লোকটার ছবি থাকত, তাকে দেখেছে গুলাম হোসেন ঝাঁসিতে। তার মানে সেই লোকটা আছে। তার মানে সিগ্রেট ভি আছে। তার মানে সেই গানা ভি আছে।

এলোমেলো এক বাতাস গোলা পাকিয়ে পাকিয়ে ঘিরে ধরল যেন তাদের। গুলাম হুসেন বলল, অতলানন্দ রায় তো, এই মনে রাখিস তো।

হাঁ, মসলন্দপুরের লম্বু খোঁজ দিতে পারবে মনে হয়। আজিজুল আবার সিজার সিগারেট বাড়িয়ে দিল। অতীন সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করল। আর নয়। এত সিগারেট তার অভ্যাস নয়। আজিজুল তার দোকানে ফিরে গেল। এখন গুলাম হুসেন আর সে। গুলাম বলল, আপনি যে গান শুনালেন হামাকে, সে গান আমার শুনা মনে হয়।

সত্যি, রেকর্ড ছিল?

হাঁ, কেউ যেন দিয়ে গেছিল। বলল গুলাম হুসেন।

বিক্রি করে গেছিল?

হাঁ সাব, আবার এমনি দিয়েও যেতে পারে। বলল গুলাম হুসেন।

এমনি দেয় কেউ?

দেয় সাব, বিডিন ইস্টিটের চ্যাটাজ্জি সাব, কত রিকর্ড দিয়ে গেল এমনিতে, বলল, আর বাঁচবেন না, তিনি না থাকলে রিকর্ড সব নষ্ট করে দেবে বেটা আর বেটার বউ, তো এপরিলে দিলেন, মে মাসের শেষে গান চলছিল বিকালে, এই আলো নিবু নিবু ভাব এসেছে, বাজছিল মুজারট, মুনলাইট সুনাটা, কখন তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেছে কেউ জানে না, কাজের একটা লোক ছিল, সে বাবুকে ডাকতে এসে দ্যাখে নেই। রেকর্ড চলছে, লং প্লেইং,ওই সুরে অন্ধ চাঁদের আলো দেখতে পায়।

আহা! চোখে জল এসে যায় অতীনের। মুন লাইট সুনাটা, সে কতকাল আগে একবার শুনেছে। আর তো হয়নি শোনা। ছেলেকে বলবে জোগাড় করে আনতে। সে বলল, আবার কবে আসব?

আসুন বাবু, হামি খোঁজ করছি, পাসিং শো, অতলানন্দ, নদীটি গিয়াছে চলিয়া, মাড়োয়ায় বাঁধা তো, দেখছি।

• পরবর্তী সংখ্যায়

অমর মিত্র *সাহিত্য একাডেমি* পুরস্কারপ্রাপ্ত ভারতীয় লেখক

ঘটনাপঞ্জি ❖ অক্টোবর

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া

- ০১ অক্টোবর ১৯০৬ ❖ শচীন দেববর্মণের জন্ম
- ০২ অক্টোবর ১৮৬৯ ❖ মহাত্মা গান্ধীর জন্ম
- ০২ অক্টোবর ১৯০৪ ❖ লালবাহাদুর শাস্ত্রীর জন্ম
- ০৫ অক্টোবর ১৮৬৮ ❖ অসমীয় লেখক লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার জন্ম
- ০৬ অক্টোবর ১৯৪৬ ❖ অভিনেতা বিনোদ খান্নার জন্ম
- ০৮ অক্টোবর ১৯৩৬ ❖ মুন্সি প্রেমচাঁদের মৃত্যু
- ১০ অক্টোবর ১৯১৬ ❖ কবি সমর সেনের জন্ম
- ১৩ অক্টোবর ১৯১১ ❖ অভিনেতা অশোককুমারের জন্ম
- ১৩ অক্টোবর ১৯৬৪ ❖ প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর মৃত্যু
- ১৩ অক্টোবর ২০০৬ ❖ প্রতিভা বসুর মৃত্যু
- ১৪ অক্টোবর ১৯৩০ ❖ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের জন্ম
- ১৪ অক্টোবর ১৯৩১ ❖ পণ্ডিত নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম
- ১৫ অক্টোবর ১৯৩১ ❖ এ পি জে আবদুল কালামের জন্ম
- ১৮ অক্টোবর ১৯৫০ ❖ অভিনেতা ওম পুরীর জন্ম
- ১৯ অক্টোবর ১৯২৪ ❖ কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জন্ম
- ২২ অক্টোবর ১৯৫৪ ❖ কবি জীবনানন্দ দাশের মৃত্যু
- ২৩ অক্টোবর ২০১২ ❖ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যু
- ২৮ অক্টোবর ২০০২ ❖ অন্নদাশঙ্কর রায়ের মৃত্যু
- ৩০ অক্টোবর ১৮৮৭ ❖ সুকুমার রায়ের জন্ম
- ৩১ অক্টোবর ১৯৭৫ ❖ শচীন দেববর্মণের মৃত্যু
- ৩১ অক্টোবর ১৯৮৪ ❖ ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু

BE 100% SURE

Dettol

BPMPA

Proud Partner of icddr,b

ডেটল সাবান সুরক্ষা দেয় ১০০ রোগবাহী জীবাণু পর্যন্ত#

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত যে নতুন ডেটল সাবান আপনার পরিবারকে ১০০টি পর্যন্ত রোগবাহী জীবাণু থেকে সুরক্ষা দেয়। এজন্যই ডাক্তাররা সবসময় পরামর্শ দিয়ে আসছেন ডেটল ব্যবহার করার জন্য।

নতুন

সুরক্ষা দেয়

১০০

রোগবাহী জীবাণু পর্যন্ত#

This is supported by Microbiological assessments versus bacteria and fungi at an external GLP facility (Bioscience Laboratories, Bozeman, Montana, USA)

** Dettol Original Soap is a Grade-1 soap

DettolBD

ধারাবাহিক

চিলিকা হ্রদের দেশে

দীপিকা ঘোষ

বর্তমানে আমেরিকাপ্রবাসী কথাসাহিত্যিক ও কলাম লেখক দীপিকা ঘোষের জন্মস্থান বাংলাদেশের ফরিদপুর। ছেলেবেলা থেকে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত। কবিতা দিয়ে শুরু। সমাজের বিচিত্র চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পরবর্তীকালে কথা- সাহিত্যে প্রবেশ। উপন্যাস, ছোটগল্প এবং প্রবন্ধ মিলিয়ে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা একুশ। ঢাকা, কলকাতা এবং উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও সংবাদপত্রে নিয়মিত তাঁর ছোটগল্প, উপন্যাস এবং প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

সাত. কোণার্ক সূর্যমন্দির

আজ সকালবেলায় ঘুম ভেঙেছিল বৃষ্টিস্নাত ধূসর দিনের অলস দৃশ্যমানতা প্রত্যক্ষ করে। স্নান সেরে বাইরে যাওয়ার প্রস্তুতি শেষ হতে না হতে দরজায় কলিংবেলের শব্দ শোনা গেল। সকালের জলখাবার নিয়ে হোটেল রুমে আজ কালকের বালক চৈতন পট্টসানি নয়, তার বদলে আবির্ভাব ঘটেছে একটি পূর্ণ বয়স্ক তরুণের। জিজ্ঞেস করতেই নাম বলল– শম্ভু নায়েক। ছেলেটি রোগা। খুব লম্বাটে গড়ন। বড় বড় দু'চোখের ছায়ায় রাজ্যের কৌতূহল কোলাহল মুখরতায় ফেটে পড়তে চাইছে। টেবিলে জলখাবার নামিয়ে রাখতে রাখতে হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল আজ দুপুরে এখানে খাবেন তো? না। আমাদের ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তাহলে রাতে? আজ প্রভুজীর 'একাদশীর পারণ' কিনা, মহারাজজী তাই জিজ্ঞেস করছিলেন। মহারাজজী? হ্যাঁ। তাঁকে চেনেন না? ওই যে গতকাল দুপুরবেলায় যে খাবার খেলেন, সে তো ওই প্রভুজীর মন্দির থেকেই দীনকৃষ্ণ স্যার আনিয়ে দিয়েছিলেন! ওঃ তাই বুঝি? ভারী চমৎকার ছিল সে খাবার! হবেই তো! মহারাজজী বড় ভক্তিভরে খুব পরিচ্ছন্ন থেকে প্রভুজীর প্রসাদ রান্না করেন যে! আচ্ছা! তাহলে তাঁকে কী বলব? মহারাজজীকে আমাদের প্রণাম জানিয়ে বোলো, রাতে আমরা নিশ্চয়ই প্রভুজীর প্রসাদ গ্রহণ করব!

নির্দিষ্ট সময়ে হোটেল গেটে পৌঁছে দেখি, কালকের কথামত ট্যাক্সি নিয়ে বুনু মোহান্তির উপস্থিতি তখনো ঘটেনি। ইতস্তত অপেক্ষায় মুহূর্ত অতিক্রান্ত হচ্ছিল। হঠাৎ চোখে পড়ল ট্যাক্সির দরজা খুলে ভাঙা বাংলায় বলরাম আমাদের উদ্দেশে হাত নেড়ে কথা বলতে বলতে দ্রুত এগিয়ে আসছে সিঁড়ির দিকে। তার মাথার ওপরে বুনু মোহান্তির মত প্লাস্টিকের পল্‌কা আচ্ছাদন নয়, একখানা ঝকঝকে তকতকে নতুন ছাতার আড়াল। ভাবলাম ডক্টর ঘোষের কথা অনুযায়ী বুনু নিশ্চয়ই ছাতা কিনে পাঠিয়েছে বলরামের হাতে। কাছে আসতে বললাম– বুনু তোমাকে দামের কথা বলেছে তো বলরাম? কিসের দাম? এই ছাতার। বুনুই তো কিনে পাঠিয়েছে? আজ্ঞা, বুনুর ধার কি আমি ধারি? এই ছাতা আমার নিজের পয়সায় কেনা! আচ্ছা বেশ! তা দাম কত পড়ল? ওই আর কি ম্যাডাম! আমরা

গরীবগুর্বো মানুষ! বেশি দাম দিয়ে তো কেনার সাধ্য নেই! তা হোক। না জানালে দামটা দেব কেমন করে? দাম আপনারা দেবেন? হ্যাঁ। বুনুর সঙ্গে তো আমাদের সে-রকম কথাই হয়েছিল। বুনুর প্রসঙ্গ আসতে বলরামের কণ্ঠস্বরে আবারও অপ্রসন্নতার পরশ লাগল। ক্ষোভের সঙ্গে ড. ঘোষের দিকে তাকিয়ে বলল– বুনু আপনাদের কী বলেছিল জানি না স্যার! তবে কাল আপনাদের এখানে নামিয়ে দেবার পরে ওর সঙ্গে আমার কোন কথা হয়নি! ও মানুষটা সুবিধের নয়!

বুঝতে বাকি রইল না এ ছাতা বলরামের নিজের, আমাদের জন্য নয়। এরপরে বুনু মোহান্তি সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন ছিল না। তবে কালকের শান্তশিষ্ট ছেলেটির অনুপস্থিতির পেছনে যে এই মানুষটাই দায়ী, সেটা ভেবে মনের উষ্ণতাও আড়াল করা গেল না। খানিকটা ক্ষেভের সঙ্গেই বললাম– কিন্তু ছাতা ছাড়া আমরা কী করে এই বৃষ্টি ভিজে সূর্যমন্দির দেখব বলরাম? প্রশ্ন শুনে মুহূর্তের জন্য বলরাম আকাশের দিকে চঞ্চল দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করে এক ঝলক কী দেখল কে জানে। পরক্ষণেই বলল– বৃষ্টি নিয়ে ভাববেন না ম্যাডাম। খানিকটা যেতে না যেতেই দেখবেন, ঝলমলিয়ে রোদ উঠেছে। তাই বললে হয়? এভাবে অনুমান করে কিছু বলা চলে? আজ্ঞে অনুমান নয়, অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা যে অন্য কথা বলছে! অসুবিধে নেই। দরকার হলে আমারটাই না হয় ব্যবহার করবেন। আমি তো ট্যাক্সিতেই বসে থাকব।

ঝিরঝিরে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছিলাম। হঠাৎ পেছন থেকে জোর গলার আওয়াজ শুনে কাঁধ ঘুরিয়ে দেখি, দ্রুতপায়ে শম্ভু নায়েক হোটেলের দীর্ঘ প্যাসেজটা পেরিয়ে ছুটে আসছে আমাদের দিকে। সেখান থেকেই চেঁচিয়ে উঁচু গলায় বলল– আগেই যাবেন না স্যার। দীনকৃষ্ণ স্যার এই ছাতাটা দিয়েছেন আপনাদের জন্য। বলেই সেটা উঁচু করে দেখাল সে। শুনেই থেমে দাঁড়িয়ে সুগভীর কৃতজ্ঞতায় ড. ঘোষ কোমল দৃষ্টিপাতে তাকাল আমার মুখে– দেখেছ, কাল রাতে ম্যানেজারবাবুকে যে বলেছিলাম বৃষ্টি ভিজলে আমার খুব অসুবিধে হয়, একখানা ছাতা কেনা দরকার, সে কথা মনে রেখেই আজ... বলতে বলতে শম্ভুর হাত থেকে হাত বাড়িয়ে ব্যগ্রভাবে ছাতাটা টেনে নিলেন ঘোষ। পরে হেসে বললেন– দীনকৃষ্ণবাবুকে আমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ! এটা পেয়ে বড় উপকার হল! কাল আমাদের ট্যাক্সি ড্রাইভারকে কিনে আনতে বলেছিলাম, কিন্তু এখনো সেটা পৌঁছয়নি আমাদের হাতে। জবাবে শম্ভু নিটোল হাসল– কেনার দরকার নেই স্যার। ফেরার পথে শুধু শুধু বোঝা বাড়িয়ে কী হবে? এখানে চাইলেই পেয়ে যাবেন। দীনকৃষ্ণস্যার তো আপনাদের বাইরে আসতে দেখেই আমাকে ডেকে বললেন, শম্ভু শিগগিরি যা, এই ছাতাটা বাবুদের দিয়ে আয়। নইলে বৃষ্টিতে ওদের খুব অসুবিধে হবে। এখন কোথায় যাচ্ছেন স্যার? সূর্যমন্দির দেখতে? হ্যাঁ। তুমিও যাবে নাকি সঙ্গে? শম্ভু এবার বিগলিত হাসল– না স্যার। ছুটি মিলবে না। কাল কোথাও যাবেন? হ্যাঁ, চিলিকা হ্রদে। জবাব শুনেই শম্ভু বাচ্চা ছেলেদের মত আবেগে তালি বাজাল দুই হাতে– চিলিকা হ্রদ? ওঃ দারুণ! দেখি দীনকৃষ্ণস্যারকে বলে যদি ম্যানেজ করতে পারি, তাহলে নিশ্চয়ই যাব আপনাদের সঙ্গে! ওখানে খুব ভাল একটা রেস্টুর‍্যান্ট আছে স্যার! ইয়া বড় বড় গলদা চিংড়ি খেতে দেয়!

তুমি গলদা চিংড়ি খেতে খুব ভালবাস বুঝি?

খুব স্যার!

আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে ম্যানেজারবাবুকে বলে ম্যানেজ করে নাও।

বৃষ্টিভেজা নিরালা পথ ধরে বে অফ বেঙ্গলের তীরে ইতিহাসবিখ্যাত সূর্যমন্দিরের উদ্দেশ্যে এখন সাঁইসাঁই করে ছুটে চলেছে বলরামের মেরুন কালার ট্যাক্সিটা। পথের দু'ধারে আশ্চর্য নির্জনতার নীরব সৌন্দর্যের অভিসার। যেদিকেই চোখ যায় দেখি, নিরালা প্রকৃতির রূপের বিস্তার চারপাশের বনান্তভূমি ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে বিরামহীন সৌন্দর্যের তরঙ্গ হয়ে। তার পরশ আমাদের মগ্ন চেতনা ছুঁয়ে ছেনে মূর্ছনার শেষ তরঙ্গ হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছিল মেঘবোঝাই আকাশের অরণ্যের মধ্যে। সহসা কোনার্ক মেরিন হাইওয়ে ধরে দ্রুতবেগে চলতে চলতে অসাধারণ এক রিসোর্টের দিকে আটকে গেল দৃষ্টিজোড়া। চারপাশে নারকেলকুঞ্জের পরিবেষ্টনীর মধ্যে সেটা দাঁড়িয়ে ছিল প্রশান্তির মহিমা নিয়ে। যেন সবুজ চন্দ্রাতপের নিচে আধুনিক ভারতে জন্ম নিয়েছে প্রাচীন ভারতের ঋষির আশ্রম। রিসোর্টের সামনে বিশাল গেটের ওপর মেটালিক হরফে সোনার রঙ ঝালিয়ে বড় বড় করে লেখা রয়েছে– 'তোশালি স্যান্ডস রিসোর্টস'।

বলরামের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই জানাল– ভেতরটা আরও বহুৎ সুন্দর আছে ম্যাডাম! নিরালা পার্ক, ওয়েডিং গ্যালারি, গলফ কোর্স, সুইমিং পুল, কনফারেন্স হল, নানা রকম মেডিক্যাল ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা, আরও কত কী! তুমি ভেতরে গিয়েছিলে বুঝি?

হ্যাঁ, সে তো কতবার! শতপতি স্যারের কাছে ফরেনাররা এলে এই রিসোর্টেই তো তাদের বেশিরভাগ এসে থাকেন। আর সাহেবরা এলেই আমার ডাক পড়ে! ফরেনারদের জন্য শতপতি স্যার আর কাউকে ঠিক ভরসা পান না কিনা, তাই!

আচ্ছা! তার মানে তুমি ওদের খুব ভাল সার্ভিস দিতে পার?

জবাবে বলরাম সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। তারপর খুশি হয়ে বলল– তোশালি স্যান্ডস রিসোর্ট ওদের খুব পছন্দের জায়গা! কত রকমের গাছ! বহুৎ সুন্দর সুন্দর কটেজ! সে-সব খুব লাক্সারিয়াসও আছে! একদিন তো এক সাহেব আমাকে ছাড়তেই চান না! সেদিন সঙ্গে বসিয়ে ক্যাফেটেরিয়ায় খুব খাইয়েছিলেন!

আচ্ছা! কী খেলে?

চাইনিজ ম্যাডাম! আমাকে এত পছন্দ হয়েছিল যে যতদিন ছিলেন আমার গাড়িতেই আসা-যাওয়া করতেন! অন্য কাউকেই একদম পছন্দ ছিল না!

বলরামের অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করতেই হয়। কিছুসময় পরে চারপাশে সবুজের শামিয়ানা হালকা হয়ে যেতেই নজরে এল মেঘের শরীর ভেঙে উজ্জ্বলমূর্তি সূর্য দেখা দিয়েছে। আর তার সোনাঝরা রোদ নানা আকারের স্খলিত চুমকি বসিয়ে দিয়েছে বৃষ্টিধোয়া শান্ত প্রকৃতির শরীর জুড়ে। বলরাম নিজের মহিমাকীর্তনে ব্যস্ত হয়ে উঠল ফের– ওই দেখুন স্যার, বৃষ্টি আর নেই। মেঘ সরিয়ে রোদ উঠেছে।

হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছিলে।

কেন বলব না স্যার? এখানকার রোদ-বৃষ্টির খেলা দেখতে দেখতে আকাশের চেহারা দেখেই যে বলে দিতে পারি, কখন কী ঘটতে যাচ্ছে! তবুও ছাতাটা সঙ্গে এনে ভালই করেছেন! এখানকার মেঘ বড় খেয়ালি কিনা! থেকে থেকেই মুডি হয়ে ওঠে!

বলরামের বক্তব্য থেকে বোঝা গেল মানুষটার মধ্যে সুকুমারবৃত্তির জাগরণ যথেষ্ট ঘটেছে। আর তাই থেকে বাক্যালাপেও সে সচেতন হয়েছে যথেষ্ট।

সকালের বৃষ্টিধোয়া সূর্যস্নাত নিবিড় সবুজের শান্ত সমুদ্র পেরিয়ে, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আমরা পৌঁছে গেলাম চিরসবুজ প্রাচীন কলিঙ্গের কোনার্ক সমুদ্রতীরে। দেখলাম, বঙ্গোপসাগর উদ্ধত গৌরবের অবিশ্রান্ত শক্তিতে সংখ্যাতীত উত্তাল ঢেউয়ের সিঁড়ি হতে হতে বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সৈকতভূমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে। পরক্ষণেই বিষধর ফণিনীর মত মাথা নুইয়ে পিছু হটে মিলিয়ে যাচ্ছে তরঙ্গভঙ্গ জলরাশিতে। দেখতে দেখতে মুহূর্তের মধ্যে রোমান্সের ডানা মেলে মন উড়ে চলল সেই সুদূর অতীতের দিকে, যে অতীত মহাভারতের কালের সীমানায় অসংখ্য ঘটনার জালে বন্দী হয়ে আছে। যেখানে শাম্বপুরাণের গল্পকাহিনিতে প্রাচীন সূর্যমন্দির অপরূপ উপাখ্যানে বর্ণিত হয়েছে গভীর রহস্যময়তায়। একদিকে বর্ণিত হয়েছে কলিঙ্গরাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের বিশাল সাম্রাজ্যের ইতিহাস আর শাসনকার্য পরিচালনায় তাঁর খ্যাতির মহিমা। অন্যদিকে সমস্যাজর্জরিত রাজপুত্র শাম্বের অব্যবস্থিত চিত্তের করুণ পরিণতির কাহিনি। পিতার অভিশাপে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়েছেন তরুণ রাজপুত্র। এই রাজপুত্র স্বয়ং মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণপুত্র সুন্দরতনু শাম্ব। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পরিত্যক্ত হয়েছেন সমাজজীবন থেকে। পরিত্যক্ত হয়েছেন একান্ত আপনার পরিবার-পরিজন থেকে। মহাঋষি কটকের নির্দেশে ব্যাধিমুক্তির প্রত্যাশায় তাই মনুষ্যহীন সাগরতীরে সূর্যদেবকে তুষ্ট করে উদ্দেশ্য চরিতার্থের লক্ষ্যে নিমগ্ন হয়েছেন কঠোর তপস্যায়। রাজপুত্র শাম্ব সেই সূর্যের সুদীর্ঘ সাধনায় নিমগ্ন হয়েছেন, যার রাঙা আলোর পরশ নির্জন সৈকতভূমে প্রতিদিন আবীর রং ছড়াতে ছড়াতে রচনা করে অকথিত ভালবাসার কাহিনি। যে সূর্য মৃত্তিকা ধরণীর সর্বত্র জীবন জাগরণের উৎসব ছড়িয়ে জীবনকে অর্থবহ করে তোলে তার অমিত কিরণের স্পর্শে।

সাগরের ব্যাপ্তি থেকে সরে এসে আমরা এখন বিশ্বখ্যাত 'সূর্যমন্দিরের' সামনাসামনি দাঁড়িয়ে। ১৯৮৪ সালে মানবজাতির এই অদ্বিতীয় অমূল্য স্থাপত্যশিল্পকে ইউনেসকো সার্বজনীন জীবনদর্শনের প্রতীক হিসেবে উপলব্ধি করে মন্দিরটিকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। কয়েক নজর বিমুগ্ধ বিস্ময়ে বাইরের গঠনশৈলী প্রত্যক্ষ করে আমাদেরও হৃদয়ঙ্গম হল উড়িষ্যার গৌরবমুকুট 'সান টেম্পল' কেন সার্বজনীন বিশ্বজীবনের সম্পদ হিসেবে বিবেচিত ইউনেসকোর কর্তাব্যক্তিদের কাছে এবং যুগ যুগ ধরে আন্তর্জাতিক ট্যুরিস্ট সমাজের মুগ্ধ দৃষ্টিকে কেনই বা অনুসন্ধিৎসু করে রেখেছে এই তিলোত্তমা।

মন বলল– মানব চেতনার সুগভীর উৎকর্ষতাকে ভাস্কর্যশিল্পের প্রতি স্তরে কেমন করে সম্ভব হয়েছে এভাবে মুখর করে তোলা? সমাজ-সংস্কৃতি, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, ধর্ম-দর্শন এবং স্থাপত্য-ভাস্কর্যের বিরল সম্মিলনের এতখানি পারঙ্গম পরিপূর্ণতা একসঙ্গে অন্য কোথাও ঘটেছে কি কোনকালে? মহাপৃথিবীর জীবনচক্রের প্রতীকী রূপের ধারক হয়ে লক্ষ লক্ষ মননশীল দর্শকের মনে যে বিস্মিত ভাললাগায় সূর্যমন্দির আজ অবধি অনিঃশেষ জ্ঞানের স্রোত নিরন্তর বয়ে নিয়ে চলেছে, কোথায় আছে তুলনা তার? মন্দিরের দেয়ালগাত্রে শিল্পসৌকর্যে যে বিশ্বসৃষ্টির ইঙ্গিত এবং বিশ্বজীবনের গভীর চিত্র আরোপিত, এক কথায় অনবদ্য তার উপস্থাপনা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সেই কারণেই কি বলতে চেয়েছিলেন গভীরতম শ্রদ্ধা নিয়ে– 'Here the language of stone surpasses the language of man?'

মন্দির চত্বরে আমাদের উপস্থিতি দেখে অন্যপাশ থেকে ছুটে এলেন গাইড মিস্টার অনন্ত রাঠ। স্মিত হেসে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন– ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, বৃষ্টিটা কিছুক্ষণ আগেই বন্ধ হয়ে গেছে! এখন সবকিছুই পরিষ্কারভাবে দেখতে পাবেন।

এখানে বৃষ্টিপাত বোধকরি একটু বেশি হয়, না? ঘোষের কণ্ঠে পরক্ষণেই কৌতূহলী প্রশ্ন ধ্বনিত হল।

হ্যাঁ তা একটু হয়, তবে সেটা বছর জুড়ে নয়। মাঝে মাঝে বেশ অনাবৃষ্টিও দেখা দেয়। বলেই মিস্টার রাঠ খানিকটা সামনে এগিয়ে মন্দিরের সিঁড়িতে পা রাখতে রাখতে বললেন– সূর্যদেবের ইতিহাস ভারতবর্ষে বড় প্রাচীন। রামায়ণের রামচন্দ্রকে অগস্ত্যমুনি সূর্যের সাধনায় দীক্ষা দিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে ইতিহাস আছে। অ্যাস্ট্রোলজার এবং অ্যাস্ট্রোনমার বরাহমিহির সৌরসূর্য নিয়ে আদ্যন্ত গবেষণা চালিয়েছিলেন, সেই তথ্যও সবার জানা। বিশ্বসৃষ্টির মূল কারণ এবং নিয়ন্ত্রক হিসেবে সূর্যের ভূমিকা যে গুরুত্বপূর্ণ, সে সম্বন্ধে পারস্যবাসীরাও সচেতন ছিলেন যথেষ্ট। তারাও তাই সূর্যের উপাসক হয়েছিলেন। বলে মুহূর্তের জন্য থেমে পড়ে পেছনে তাকিয়ে কোমল স্বরে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করলেন মিস্টার রাঠ– এখানকার সিঁড়িতে একটু সাবধানে পা রাখবেন ডক্টর ঘোষ! ধাপগুলো বেশ খাড়া! সাবধান!

হ্যাঁ একটু বেশিই উঁচু! মন্দিরটাকেও খুব ম্যাসিভ বলে মনে হচ্ছে!

বাঃ হবে না! স্টোনের তৈরি তো! তার ওপর এর দেয়ালের গাঁথুনি আবার পঁচিশ ইঞ্চি পুরু! সাহেব ট্যুরিস্টদের অনেকেই তাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, অত প্রাচীনকালে কী করে এত ভারী ভারী পাথর অত উঁচুতে তোলা সম্ভব হয়েছিল! আর কী করেই বা স্তরে স্তরে সাজানো হয়েছিল সেগুলোকে?

হ্যাঁ খুবই যৌক্তিক প্রশ্ন। কী করে হয়েছিল?

সেটা আধুনিক মানুষের কাছে এখনো বিরাট রহস্য। এ সম্বন্ধে সঠিক উত্তরও জানা নেই। তবে গবেষকদের বিভিন্ন অনুমান রয়েছে। কেউ কেউ বলছেন, বিশেষ ধরনের দড়ি ব্যবহার করে ম্যানপাওয়ারই এই অসাধ্য সাধন করেছে। আবার কারুর মতে সম্ভবত বিশেষ ধরনের ল্যাডারও ব্যবহৃত হয়েছিল।

কয়েক ধাপ ওপরে উঠে আমাদের গাইড মুখ খুললেন ফের– প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, পশ্চিম ভারতের 'সোমনাথ মন্দিরের' মত পূর্ব উপকূলে অবস্থিত কলিঙ্গের 'সূর্য মন্দিরে'রও রয়েছে বার বার আক্রমণে ভাঙাগড়ার ইতিহাস। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণপুত্র শাম্ব থেকে প্রথম এর ইতিহাস শুরু। এখানে তখন চন্দ্রভাগা নদী প্রবাহিত ছিল। সেখানে প্রতিদিন স্নান করে রাজপুত্র শাম্ব সূর্যদেবের প্রার্থনা করতেন কুষ্ঠব্যাধি নিরাময়ের জন্য। চন্দ্রভাগা কবে নিঃশেষিত হয়েছে নির্দিষ্ট করে জানা নেই। তবে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে মহা ধুমধামে 'চন্দ্রভাগা ফেস্টিভ্যাল' আজও এখানে উদ্‌যাপিত হয়। সব শেষে ১২৪৩ থেকে ১২৫৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোনার্ক সূর্যমন্দির নির্মাণ করেন গঙ্গাবংশীয় রাজা

নরসিংহ দেব। বারো হাজার শ্রমশিল্পী বারো বছরের শ্রমসাধনা দিয়ে নির্মাণ করেছিলেন এই অনিন্দ্যসুন্দর ভাস্কর্য!

পেছনের বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ পেরিয়ে অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলাম ওপরে। সামনে তাকাতেই চোখে পড়ল, অদূরে উদ্দাম সাগরের জীবানুভূতি, উচ্ছ্বাসের উচ্ছলতায় অহংকারে বিকশিত। সূর্যমন্দিরের চারপাশ জুড়ে তার আহ্বান যেন ফেটে পড়ছে মহা আলোড়নের সমারোহ তুলে। কয়েক পা অগ্রসর হয়ে ডানপাশে দৃষ্টি ছুঁতে নজরে এল, সামনের দরজার বাইরে দুটি স্তম্ভের ওপরে অসাধারণ দুই সিংহের মূর্তি বহু শতাব্দী পেরিয়েও জীবনচাঞ্চল্যে বেগময়। যেন চেতনার আবেগ তাদের শরীরী ভঙ্গিতে বাঙ্ময় হতে চাইছে। ভেতরে বিশাল আকারের সৌর সূর্যদেব স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে। সমর্থ হাতে ধরে রেখেছেন সৃষ্টিতত্ত্বের লীলাপদ্ম। এই সৃষ্টিতে কেবল যে স্থাপত্য-সৌন্দর্যই জমকালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাই নয়। এদের ইঞ্জিনিয়ারিং দক্ষতাও যে একান্তভাবে নিখুঁত ছিল, সেটা যে কোন সাদা চোখেও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে অনায়াসে। দেখতে দেখতে আমরা মোহিত হয়ে যাচ্ছিলাম। বহু শতাব্দী পূর্বে একটি সুচিন্তিত দর্শনকে সূক্ষ্ম কারুকার্যের দক্ষতায় যাঁরা পাথরের কাঠিন্য কেটে মূর্তির দেহে, মন্দির গাত্রে মুখর করতে পেরেছিলেন, তাঁদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং পরিশ্রম করার সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে কত বড় মাপের ছিল সে কথা ভেবে শ্রদ্ধায়, কৃতজ্ঞতায় মাথা নত হয়ে যাচ্ছিল তাঁদের শক্তিমান দৃঢ় পদতলে।

দেখতে দেখতে মন্দিরের ভেতরে স্তূপীকৃত বালির পাহাড়ে নজর পড়তেই ঘোষ জানতে চাইলেন– এখানে বালির এত স্তূপ কেন?

মন্দিরের ভারসাম্য রক্ষার জন্য ইন্ডিয়ান আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে গ্রুপ এখানে বালি ঢেলেছিলেন ১৯০১ থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত।

কেন?

কারণ বারবার আক্রমণের আঘাতে এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মন্দিরের অনেকটাই ধসে গিয়েছিল। অযত্নে অবহেলায় কয়েকশো বছর ধরে সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি পরাধীন ভারতবর্ষে। ব্রিটিশ পিরিয়ডে প্রথম রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু হয়। দেয়াল ফুটো করে ফানেল বসিয়ে তার ভেতর দিয়ে বালি ঢেলে একে খাঁড়া রাখার চেষ্টা চলে। এখনও প্রতি বছর দু'বার করে সার্ভে গ্রুপ জরিপের কাজটি চালিয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা এবার নিচে চলুন।

খোলা সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে আসতে চোখে পড়ছে, আকাশ জুড়ে এখনো মেঘ রোদ্দুরের নিবিড়তর খেলা চলছে থেকে থেকে। অনন্ত সাগরের উদ্দাম হাওয়া আলুলায়িত ভঙ্গিতে নিজেকে ছড়িয়ে ছাপিয়ে মহাকৌতুকে ফেটে পড়ছে উন্মুক্ত চরাচর ঘিরে। আমাদের গাইড সিঁড়ির মাঝপথেই আবার কথা বললেন– অন্য যে সূর্যমন্দিরটির বিস্তৃত বর্ণনা আমরা গ্রিক এ্যাডমিরাল স্কাইল্যাক্স এবং চিনা পর্যটক ইউয়েন সাঙের লেখায় পাই তার অবস্থান মূলস্থানে। প্রাচীন নাম কাশ্যপপুর। বর্তমান পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের মূলতান হল সেই মূলস্থান।

শুনতে শুনতে এতক্ষণ পরে ভারী অবাক হয়ে আমি মন্তব্য করলাম– ও মা তাই নাকি? কিন্তু মূলতানেও যে একটি সূর্যমন্দির রয়েছে জানতাম না তো!

জবাবে দু'দিকে মাথা দুলিয়ে আমাদের প্রবীণ গাইড নিরানন্দ হাসলেন। বললেন– এখন আর সেটি নেই ম্যাডাম! সহস্র সহস্র হিন্দুদের সেই তীর্থস্থান প্রথম ধ্বংস করে লুটতরাজ করে ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে মুহম্মদ বিন কাশিম! কয়েকশো বছর পরে গজনীর সুলতান মাহমুদ সেটিকে একেবারেই গুঁড়িয়ে দেয় বাকি ধনরত্ন লুণ্ঠন করে!

নিচে নেমে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে এবার সূর্যমন্দিরকে উপলব্ধি করতে চাইলাম অন্তরে। দেখলাম বঙ্গোপসাগর তীরের সূর্যমন্দির একটি চলন্ত রথের ওপরে নির্মিত। যে রথ সাতটি ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে বারো জোড়া চাকার ওপরে ভর করে অবিশ্রান্ত পায়ে এগিয়ে চলেছে যুগ থেকে যুগান্তরে। পেরিয়ে চলেছে কাল থেকে কালান্তর। এই রথ তাই চলিষ্ণু সূর্যের অসীমকালের প্রতিভূ। এই রথ বিশ্বজীবন আর বিশ্বসৃষ্টির একত্রিত ইতিহাসের কথা বলছে। যারা একই সত্তা থেকে উত্থিত হয়ে সমান্তরাল চলতে চলতে শ্রান্তিহীন এগিয়ে চলেছে মহামিলনের পথে। জীবনের আধ্যাত্মিক পরিণতি এবং পার্থিব পৃথিবীর জীবজগতের কাহিনি দুইই এতে স্থান লাভ করেছে শিল্পসৃষ্টির সমমর্যাদায়। তাই চলন্ত রথের দেয়াল জুড়ে নির্মিত হয়েছে নানা দেবদেবীর অনিন্দ্যকান্তি স্বর্গীয়ভাবের মূর্তি। রয়েছে স্বর্গমর্ত্যের গায়ক-গায়িকা; নৃত্যরত নর্তক-নর্তকীর বিভিন্ন মুদ্রার গঠনবৃত্তান্ত; লাস্য ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে থাকা মানব-মানবীর মিথুন প্রতিচ্ছবি; যুদ্ধরত অকুতোভয় সৈনিক; আনন্দিত বিশ্রামরত আবালবৃদ্ধবণিতা; অরণ্যপ্রকৃতির পাশাপাশি পৌরাণিক জীবজন্তুর চিত্র। এরা প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট জ্যামিতিক ডিজাইনের মধ্যে বন্দী থেকে এক অসাধারণ শোভাযাত্রায় এগিয়ে চলেছে অন্তহীন কাল ধরে সেই অসীমের দিকে, যার থেকে বিশ্বজগত সৃষ্টি। বিজ্ঞান বলছে, সূর্য স্বয়ং সৃষ্টির নিয়ন্ত্রক। তারই উত্তাপে জগৎ সদা সৃষ্টিশীল। সূর্য তাই ভারতবর্ষের চোখে কেবল অগ্নিময় জড়বস্তু হয়ে নন, ধরা দিয়েছেন এক শক্তিধর বিশ্বনিয়ন্তা হিসেবে। যাঁর হাতে সৃষ্টির চলন্ত রথ অনাদিকাল ধরে নিয়ন্ত্রিত। ভারতবর্ষের আরও অনেক মন্দিরের মত সূর্যমন্দির তাই সেকিউলার জীবনের প্রতিফলন। যেখানে মানবসভ্যতার, মানবসমাজের জীবনদর্শন, মানবধর্ম ও বিজ্ঞান, রাজনীতি এবং সংস্কৃতির সার্বিক চেতনার সম্পূর্ণ সম্মিলন ঘটেছে।

চলে আসার আগে গাইড অনন্ত রাঠ হঠাৎ গাম্ভীর্যের আচ্ছাদন পরে বললেন– অনেক ট্যুরিস্টই জিজ্ঞেস করেন, পবিত্র মন্দির গাত্রে এসব ইরোটিক পিকচার কেন রয়েছে। তাদের প্রত্যেককেই বলি, যেখানে সৃষ্টির কথা বলছি সেখানে সৃষ্টির কারণ সম্পর্কে বলব না, তাই কখনো হয়? ভারতবর্ষের চিন্তাশীল মানুষ কখনই কোন বিষয়কে অপবিত্র বলে ভাবেননি, যতক্ষণ না তা চিত্তকে কলুষিত করে! স্বয়ং ঈশ্বর যেখানে সৃষ্টির ধারাকে প্রবাহিত রাখেন পারস্পরিক মিলনের মাধ্যমে, সেখানে বিশ্বসৃষ্টির প্রতীককে লুকিয়ে রাখার চিন্তা ভারতের চিন্তাবিদরাও কোনদিন করেননি!

শুনতে শুনতে মনে হল, শিল্পকর্ম যদি কোন মানুষের মনে সৌন্দর্যের স্বর্গীয় অনুসন্ধান বয়ে না আনে, তাহলে বিশ্বজনীন এই অসাধারণ শিল্পকর্ম দর্শন করার কোন অধিকার তাদের নেই, এমন ইঙ্গিতই সম্ভবত দিতে চাইছেন আমাদের প্রবীণ গাইড পণ্ডিত অনন্ত রাঠ।

• পরবর্তী সংখ্যায়

দীপিকা ঘোষ
প্রবাসী বাঙালি কথাসাহিত্যিক

এ পি জে আবদুল কালাম

ভারতের একাদশ রাষ্ট্রপতি আবুল পাকির জয়নুলাবেদিন আবদুল কালামের কর্মজীবন শুরু হয়েছিল একজন বিজ্ঞানী হিসেবে। পরে তিনি ঘটনাচক্রে রাজনীতিবিদে পরিণত হন। পদার্থ ও বিমান প্রযুক্তিবিদ্যায় পড়াশোনার পর চল্লিশ বছর তিনি ভারতীয় প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা ও ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থায় বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান প্রশাসক হিসেবে কাজ করেন। ভারতের বেসামরিক মহাকাশ কর্মসূচি ও সামরিক ক্ষেপণাস্ত্র উন্নয়ন কর্মসূচির সঙ্গে তিনি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিলেন। ব্যালাস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও মহাকাশযানবাহী রকেট উন্নয়নের কাজে অবদানের জন্য তাঁকে 'মিশাইল ম্যান অফ ইন্ডিয়া' বলা হয়। ১৯৯৮ সালে পোখরান-২ পরমাণু বোমা পরীক্ষায় তিনি প্রধান সাংগঠনিক, প্রযুক্তিগত ও রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেন। এটি ছিল ১৯৭৪ সালে 'স্মাইলিং বুদ্ধ' নামে পরিচিত প্রথম পরমাণু বোমা পরীক্ষার পর ভারতের দ্বিতীয় পরমাণু বোমা পরীক্ষা।

২০০২ সালে তৎকালীন শাসকদল ভারতীয় জনতা পার্টি ও বিরোধী দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থনে তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। পাঁচ বছর এই পদে আসীন থাকার পর তিনি শিক্ষাবিদ, লেখক ও জনসেবকের সাধারণ জীবন বেছে নেন। তিনি ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান 'ভারতরত্ন'সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সম্মান ও পুরস্কার লাভ করেন।

এ পি জে আবদুল কালাম ১৯৩১ সালের ১৫ অক্টোবর ব্রিটিশ ভারতের মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির (অধুনা তামিলনাড়ু রাজ্যের) রামেশ্বরমের এক তামিল মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা জয়নুল আবেদিন ছিলেন একজন নৌকামালিক এবং মা অশিয়াম্মা গৃহবধূ। তাঁর দরিদ্র বাবা রামেশ্বরম ও অধুনালুপ্ত ধনুষ্কোডির মধ্যে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের নৌকায় পারাপার করতেন। খুব অল্প বয়সেই পরিবারের ভরণপোষণের জন্য তিনি সংবাদপত্রের হকারি শুরু করেন। বিদ্যালয়ে তিনি ছিলেন সাধারণ মানের ছাত্র, তবে বুদ্ধিদীপ্ত ও কঠোর পরিশ্রমী। তাঁর শিক্ষাগ্রহণের বাসনা ছিল তীব্র। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি পড়াশোনা করতেন ও অঙ্ক কষতেন। রামনাথপুরম স্কোয়ার্টজ ম্যাট্রিকুলেশন স্কুল থেকে শিক্ষা সম্পূর্ণ করার পর তিনি তিরুচিরাপল্লির সেন্ট জোসেফ'স কলেজে ভর্তি হন। ১৯৫৪ সালে এ কলেজ থেকে পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতক হন। পাঠক্রমের শেষদিকে তিনি পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। পরবর্তীকালে চার বছর ওই বিষয় অধ্যয়ন করে নষ্ট করার জন্য তিনি আক্ষেপ করতেন। ১৯৫৫ সালে তিনি মাদ্রাজে (অধুনা চেন্নাই) চলে আসেন। এখানকার মাদ্রাজ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে তিনি বিমানপ্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। একটি সিনিয়র ক্লাস প্রোজেক্টে কাজ করার সময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ডিন তাঁর কাজে অগ্রগতি না দেখে অসন্তুষ্ট হন এবং তিন দিনের মধ্যে কাজ শেষ করতে না পারলে তাঁর বৃত্তি প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে বলে ভয় দেখান। কালাম তিন দিনেই কাজ শেষ করেন। এতে ডিন খুশি হন। পরে তিনি কালামকে লিখেছিলেন, 'আমি তোমাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলাম। তোমাকে এমন সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে বলেছিলাম যা করা খুব শক্ত।' তিনি অল্পের জন্য যোদ্ধা পাইলট হওয়ার সুযোগ হারান। ওই পরীক্ষায় ভারতীয় বিমানবাহিনির আটজন কর্মীর দরকার ছিল। তিনি হয়েছিলেন নবম।

আবদুল কালাম ১৯৬০ সালে স্নাতক সমাপ্ত করে ভারতীয় প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থার এয়ারোনটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট এস্টাবলিশমেন্ট-এ বিজ্ঞানী হিসেবে যোগ দেন। ওই প্রতিষ্ঠানে তিনি একটি ছোট হোভারক্রাফ্টের নকশা তৈরি করে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। কালাম আইএনসিওএসপিএআর কমিটিতে ড. বিক্রম সারাভাইয়ের অধীনে কাজ করতেন। ১৯৬৩-৬৪ সালে তিনি নাসার ল্যাংলি রিসার্চ সেন্টার, গডহার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টার এবং ওয়ালপস্ ফ্লাইট ফ্যাসিলিটি পরিদর্শন করেন। ১৯৬৯ সালে তিনি ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থায় যোগ দেন। সেখানে তিনি ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণকারী যান এসএলভি-থ্রি-র প্রকল্প পরিচালক ছিলেন। ১৯৮০ সালের জুলাইয়ে এ সংস্থাই 'রোহিণী' কৃত্রিম উপগ্রহকে তার কক্ষপথে স্থাপন করে।

২০১৫ সালের ২৭ জুলাই মেঘালয়ের শিলংয়ের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টে বসবাসযোগ্য পৃথিবী বিষয়ে বক্তব্য দানকালে ভারতীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা নাগাদ তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বেথানি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

কালামের মৃতদেহ ভারতীয় বিমানবাহিনির একটি হেলি-কপ্টারে করে শিলং থেকে গৌহাটি নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে একটি সি-১৩০ হারকিউলিস বিমানে করে নতুন দিল্লির পালাম বিমান ঘাঁটিতে নিয়ে যাওয়া হয়। রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং তিন বাহিনির প্রধান কালামের মরদেহে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। এরপর জাতীয় পতাকায় আবৃত করে কালামের দেহ রাজাজি মার্গে তাঁর দিল্লির বাসস্থানে নিয়ে যাওয়া হলে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদবসহ বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

তাঁর সম্মানে সরকার সাত দিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালনের ঘোষণা দেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'কালামের মৃত্যু দেশের বিজ্ঞান জগতের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। তিনি ভারতকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন ও পথ দেখিয়েছিলেন।' চতুর্দশ দালাই লামা কালামের মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করে বলেন, 'কালাম শুধু একজন বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাবিদ বা রাষ্ট্রনেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন সরল ও বিনয়ী এক নিপাট ভদ্রলোক।' ভূটান সরকার সে-দেশের পতাকা অর্ধনমিত রাখার পাশাপাশি ১০০০টি বাতি প্রজ্বলনের নির্দেশ দেন। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতৃবর্গ তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন।

● নিজস্ব প্রতিবেদন
সূত্র ইন্টারনেট

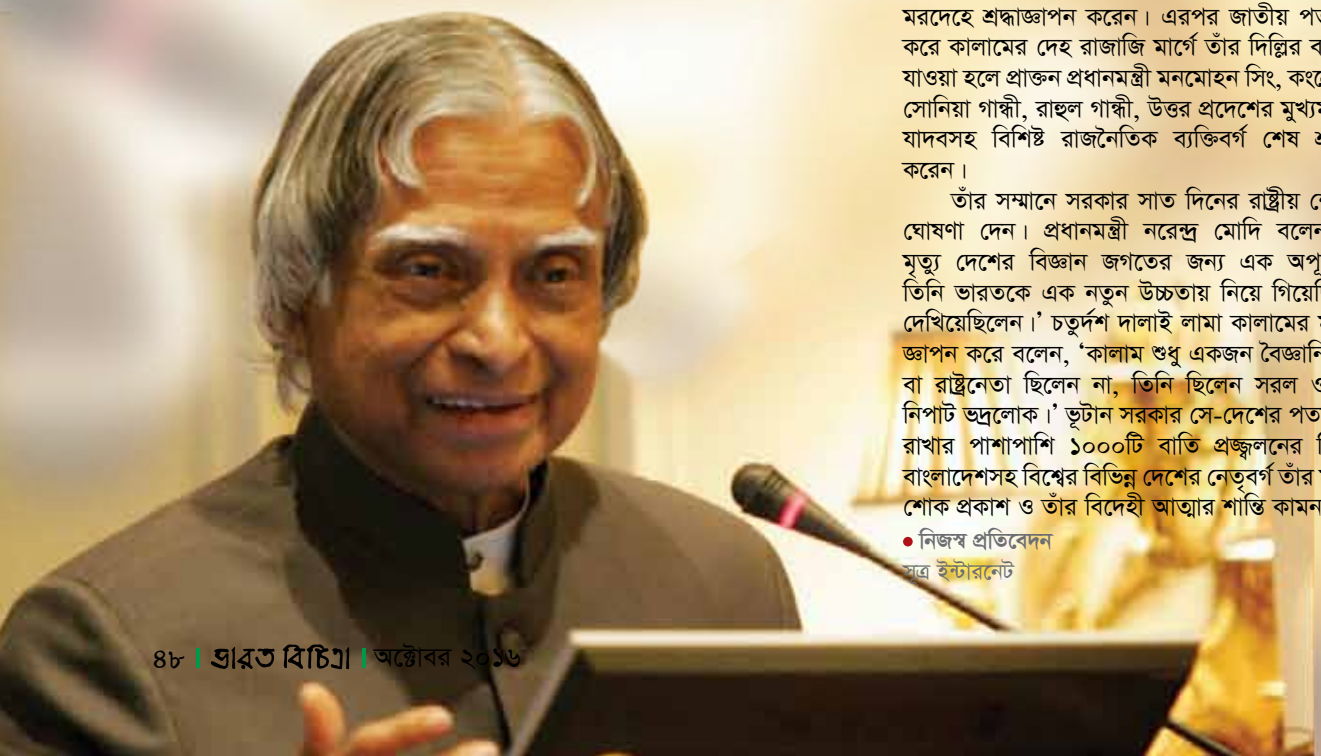

০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬
হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা
আইআইটি-র সফররত প্রতিনিধিদলের
সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আইআইটি
এখন বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রীদের
জন্য উন্মুক্ত

৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ বাংলাদেশ ক্রিকেট
আম্পায়ার্স এন্ড স্কোরার্স এসোসিয়েশন ও
ভারতীয় হাই কমিশন ঢাকা ক্রিকেট দলের
মধ্যে অনুষ্ঠিত টি-২০ প্রীতি ক্রিকেট
ম্যাচের খেলোয়াড়বৃন্দ

৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ ঢাকায় 'কলাবরেট ২০১৬' শীর্ষক
চোখের যত্নবিষয়ক ভারত-বাংলাদেশ যৌথ সম্মেলনে বিশেষ
অতিথি শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। বাংলাদেশ চক্ষু হাসপাতাল এবং
কলকাতার দিশা চক্ষু হাসপাতাল আয়োজিত এ সম্মেলনে
ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ ও
চক্ষু হাসপাতালের চক্ষু বিশেষজ্ঞ, ডাক্তার ও প্রতিনিধিরা
অংশগ্রহণ করেন

০৫ অক্টোবর ২০১৬ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন
পরিচালিত গুরু-শিষ্য পরম্পরার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত
বিদ্যালয় 'বেঙ্গল পরম্পরা সংগীতালয়ে'
হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলাকে
অভ্যর্থনাজ্ঞাপন। হাই কমিশনার বিদ্যালয়ের
ছাত্রছাত্রীদের খেয়াল ও তবলাবাদন উপভোগ
করেন। ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টিতে
খেয়াল, ধ্রুপদ, তবলা, সরোদ ও সেতার
বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়

Regd. No. DA 355 Bharat Bichitra October 2016

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

গ্রাহক তালিকা পর্যালোচনা ও হালনাগাদ

আমরা ভারত বিচিত্রার গ্রাহক তালিকা পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করছি। যে-সব গ্রাহক ভারত বিচিত্রার মুদ্রিত সংস্করণ পেতে ইচ্ছুক, তাঁদের নাম, পূর্ণ ঠিকানা ও টেলিফোন/মোবাইল নম্বরসহ নিচের ফরম পূরণ করে সম্পাদকের কাছে পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এখনও যাঁরা পাঠাননি কিংবা পাঠাতে বিলম্ব করছেন, তাদের ঠিকানায় ভবিষ্যতে ভারত বিচিত্রা পাঠানো হবে না। আশা করি সুধী পাঠক সাড়াদানে বিলম্ব করবেন না।

আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ইতোমধ্যে ভারত বিচিত্রার অনলাইন এডিশন চালু হয়েছে। আপনারা অনলাইনেও ভারত বিচিত্রা পড়তে পারেন। মুদ্রিত ভারত বিচিত্রার পরিবর্তে ই-মেইলে পেতে চাইলে সহজেই পেতে পারেন। যাঁরা ই-মেইলে ভারত বিচিত্রা পেতে ইচ্ছুক তাঁদের ই-মেইল ঠিকানা পাঠাবেন। আগ্রহী পাঠক ফেইসবুকেও ভারত বিচিত্রা নিচের লিংকে পড়তে পারেন: https: //www.facebook.com/BharatBichitra.

যোগাযোগের ঠিকানা

সম্পাদক, ভারত বিচিত্রা, ভারতীয় হাই কমিশন
বাড়ি নং ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২, ফোন ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯ এক্স: ১২২৪
e-mail: editor.bb@hcidhaka.gov.in

আমি ভারত বিচিত্রার মুদ্রিত সংস্করণ পেতে ইচ্ছুক:

নাম: .....

পূর্ণ ঠিকানা: .....

.....

.....

.....

ফোন/মোবাইল: .....

ইংরেজিতে ব্লক লেটারে দ্রুত লিখে পাঠান...

আমি ভারত বিচিত্রার মুদ্রিত সংস্করণ পেতে ইচ্ছুক:

নাম: .....

পূর্ণ ঠিকানা: .....

.....

.....

.....

ফোন/মোবাইল: .....

ই-মেইল: .....

ইংরেজিতে ব্লক লেটারে দ্রুত লিখে পাঠান...

জনস্বার্থে ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা কর্তৃক প্রচারিত